সেচপত্র

জুলাই—সেপ্টেম্বর ২০০১

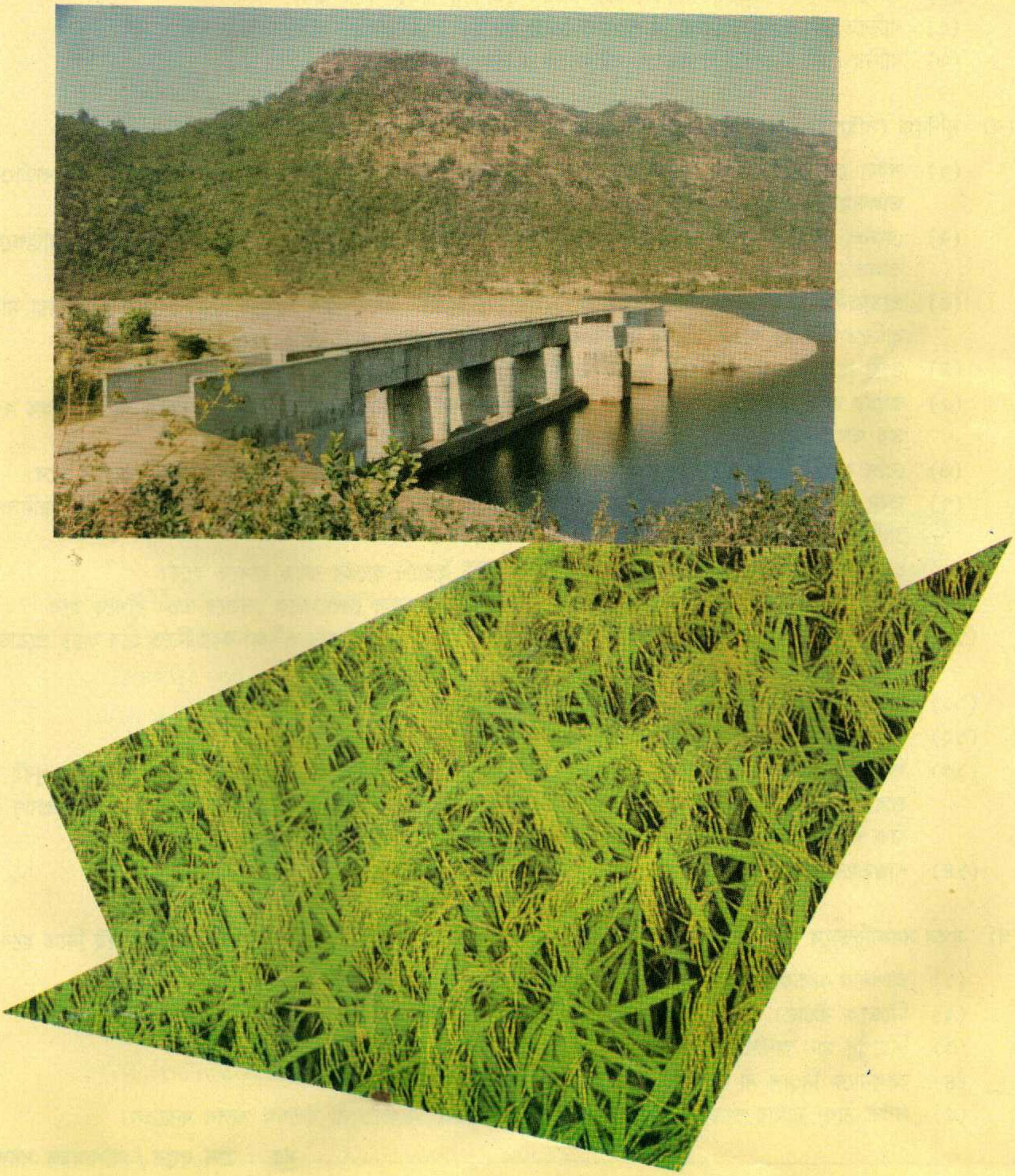

ঘূর্ণিঝড়ে (সাইক্লোন) জনসাধারণের পালনীয়

(ক) ঘূর্ণিঝড়ের (সাইক্লোন) মরশুম শুরু হওয়ার আগে নিম্নলিখিত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে—

(১) বাড়ির সমস্ত দরজা ও জানালা, আলগা টালি এবং অন্যান্য দুর্বল অংশগুলো প্রয়োজনীয় মালমশলা (সিমেন্ট, বালি ইত্যাদি) দিয়ে মেরামত করা।

(২) বাড়ির চারিদিকে পুরোন গাছ বা ডাল কেটে ফেলা। আলগা ইট, সাইনবোর্ড, টিনের পাত্র ইত্যাদি সরিয়ে ফেলা।

(৩) কাঠের বোর্ড, কাগজের টেপ ইত্যাদি হাতের কাছে রাখা যাতে প্রয়োজন অনুযায়ী কাচের জানালাগুলো ঢেকে দেওয়া যায়।

(৪) হারিকেন, মোমবাতি, কেরোসিন, টর্চ, ব্যাটারি ইত্যাদির ব্যবস্থা করে রাখা।

(৫) বাড়িতে বসবাসের অযোগ্য অংশগুলো ভেঙে ফেলা।

(৬) বাড়ির রেডিও সেটটি ভালভাবে পরীক্ষা করে সচল অবস্থায় রাখা।

(খ) ঘূর্ণিঝড় (সাইক্লোন) সংক্রান্ত সতর্কবার্তা পাওয়ার পরে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি নিতে হবে—

(১) সর্বদা রেডিও সেটটিকে চালু রাখতে হবে এবং আকাশবাণী কলকাতার আবহাওয়া সংক্রান্ত সতর্কবার্তাগুলো ভালভাবে শুনতে হবে।

(২) কোনও রকম গুজবে কান দেবেন না। কেবলমাত্র রেডিও, টিভি মারফৎ প্রচারিত আবহাওয়ার বিজ্ঞপ্তিগুলোই ভালভাবে শুনবেন।

(৩) প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাওয়ামাত্র সমুদ্র উপকূলের নিচু জায়গা থেকে সরে আসতে হবে। বিশেষ করে যাঁরা মাটির বাড়িতে বসবাস করেন তাঁদের উঁচু জায়গায় উপযুক্ত বাসস্থানে সরে যেতে হবে।

(৪) ভারী বর্ষণ অথবা জোয়ারের সময় বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে।

(৫) কাচের জানালাগুলোতে কাঠের বোর্ড বা কমপক্ষে কাগজ সেঁটে দিতে হবে। এতে কাচ ভেঙে কারও আহত হবার ভয় থাকবে না।

(৬) বেশি করে শুকনো খাবার মজুত রাখতে হবে। ঢাকা পাত্রে বেশি করে পানীয়জলের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(৭) যখন আপনার এলাকার লোকজনকে নিরাপদ স্থানে সরে যেতে বলা হবে তখন ঘরের মূল্যবান জিনিসপত্র, টাকাপয়সা সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

(৮) হারিকেন, মোমবাতি, কেরোসিন, টর্চ, ইমার্জেন্সি লাইট ইত্যাদি হাতের কাছে রাখতে হবে।

(৯) ঘরের বাইরে কোদাল, কুড়ুল টিনের পাত্র, ঝুড়ি ইত্যাদি থাকলে সেগুলোকে ভেতরে এনে রাখতে হবে।

(১০) বাড়ির পিছন দিকের দরজা বা জানালা সহজে খোলা যায় কিনা ভালভাবে পরীক্ষা করে নিতে হবে যাতে প্রয়োজনে বেরিয়ে যাওয়া যায়।

(১১) বাড়ির বাচ্চা এবং বয়স্কদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(১২) গরু-বাছুর, ছাগল ইত্যাদি গৃহপালিত পশুদের অন্যত্র সরিয়ে ফেলতে হবে।

(১৩) যখন ঘূর্ণিঝড়ের (সাইক্লোন) কেন্দ্রবিন্দু বা 'চোখ' আপনার এলাকায় অবস্থান করবে তখন বাতাসের বেগ খুবই কম হবে এবং আধ ঘণ্টার মতন আবহাওয়ার উন্নতি হবে। এই সময় অবশ্যই নিরাপদ স্থানে থাকতে হবে কারণ এর ঠিক পরেই প্রচণ্ডগতিতে উল্টোদিক থেকে বাতাস বইবে এবং ভারী বর্ষণ হবে।

(১৪) শান্তভাবে ঠাণ্ডা মাথায় দুর্যোগের মোকাবিলা করতে হবে।

(গ) যখন সরকারিভাবে আপনার এলাকাকে খালি করতে বলা হবে তখন নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো সঙ্গে সঙ্গেই নিতে হবে—

(১) আপনার এলাকার স্কুলবাড়ি বা নিরাপদ আশ্রয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবেন।

(২) নিজেকে বাঁচান। আপনার সম্পত্তির জন্য চিন্তা করবেন না।

(৩) নিরাপদ স্থান অর্থাৎ 'শেল্টারের' ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের পরামর্শমত চলুন।

(৪) আপনাকে নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত উপরোক্ত স্থানেই থাকবেন।

(৫) সর্বদা ঠাণ্ডা মাথায় শান্তভাবে থাকার চেষ্টা করবেন এবং নির্দেশগুলো যথাযথ পালন করবেন।

সূত্র : ত্রাণ দপ্তর / পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সেচপত্র

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগের মুখপত্র
সপ্তম বর্ষ ❖ জুলাই - সেপ্টেম্বর, ২০০১

সম্পাদকীয় বিভাগ

সভাপতি
অমলেন্দ্র লাল রায়
মন্ত্রী, সেচ ও জলপথ বিভাগ

প্রধান সম্পাদক
চন্দন রায়
মুখ্য বাস্তুকার-১

সংযুক্ত সম্পাদক
সমরেশ কুণ্ডু ❖ নির্বাহী বাস্তুকার
গৌতম সান্যাল ❖ সহ-বাস্তুকার
রাজকাপুর শর্মা ❖ সহ-বাস্তুকার
দিলীপ কর্মকার ❖ অবর সহ-বাস্তুকার
শচীন দাশ ❖ পরিসংখ্যান ও প্রকাশন সহায়ক

জলসম্পদ ভবন ◻ বিধান নগর
দূরভাষ : ৩৫৮-০৫২৮
ফ্যাক্স : ০৩৩-৩৩৪-৬২৪৫/৩২১-৪৯২৮
ই-মেল : ce2iwd@cal3.vsnl.net.in

সেচপত্র

সেচপত্র

সপ্তম বর্ষ □ জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০০১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ♦ ৩

পাঠকের কলম ♦ ৪

ময়ূরাক্ষী জলাধার : স্বাধীনোত্তর ভারতের অন্যতম একটি বহুমুখি সেচপ্রকল্প
অঞ্জন দাশগুপ্ত, অধীক্ষক বাস্তুকার / সেচ ও জলপথ দপ্তর ♦ ৫

খরাপ্রবণ জেলা পুরুলিয়ার উন্নয়নে ফুটিয়ারি সেচপ্রকল্প ♦ ১১

সংক্ষিপ্ত সংবাদ ♦ ১২

উপকূল ক্ষয়রক্ষার প্রয়োজনীয়তা
দিলীপ চক্রবর্তী, নির্বাহী বাস্তুকার / সেচ ও জলপথ দপ্তর ♦ ১৩

নিকাশি খালগুলির সাধারণ সমস্যা
দিলীপ কর্মকার, অবর সহ-বাস্তুকার / সেচ ও জলপথ দপ্তর ♦ ১৫

সেপ্টেম্বর ২০০০ বন্যা পরবর্তী পুনর্গঠন ⇔ একটি প্রতিবেদন ♦ ১৭

উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে সেচ ও জলপথ বিভাগ ⇔ একটি প্রতিবেদন ♦ ২২

বিশ্ববিচিত্রা ♦ ২৭

সেচ ও জলপথ দপ্তরের বিভিন্ন অফিসের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ♦ ৩১

বিজ্ঞপ্তি ♦ ৩৩

সম্পাদকীয়

বিগত ২০০০ সালের বন্যাপূর্বোত্তর পরিস্থিতিতে আমরা অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে লক্ষ করেছি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম এই দপ্তরের নানা কাজ নিয়ে এমনভাবে সংবাদগুলি উপস্থাপনা করছেন যে নানা ক্ষেত্রে একতরফাভাবে আমাদের বিরুদ্ধে জনরোষ তৈরির অবস্থা হচ্ছে। দোষত্রুটির সমালোচনা একান্তই কাম্য। কিন্তু প্রকৃতির বিধ্বংসী খেয়ালিপনার সঙ্গে প্রতিনিয়ত যে অসম লড়াই সেচদপ্তরকে করতে হয় তার প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজয়ী হওয়া অসম্ভব। সেইসব পরাজয়ের দায়ভার নির্দিষ্টভাবে শুধুমাত্র সেচদপ্তরের ওপর চাপিয়ে তার কর্মরত সমস্ত স্তরের কর্মচারীদের অনবরত গালিগালাজ করে তাদের মনোবল ভেঙে দেওয়া কোনোভাবে সমাজের মঙ্গল সূচনা করে না। আর্থিক সংস্থান ও বিজ্ঞান প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতা যদি সঠিকভাবে বিবেচিত না হয় তবে প্রকৃতির বিধ্বংসী রুদ্ররূপের সঙ্গে আমাদের প্রতিনিয়ত লড়াইয়ের প্রচেষ্টা স্বাভাবিকভাবেই প্রতিহত হবে। আর সেটা হলে সমাজের পক্ষে বিশেষভাবে ক্ষতিকারক। প্রসঙ্গক্রমে সমস্যা সমাধানে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও আমাদের প্রচেষ্টার সীমাবদ্ধতার একটা ছোট উদাহরণ হল নদীর নাব্যতা বাড়াতে ড্রেজিং পদ্ধতির ব্যাপক ব্যবহারের সাম্প্রতিক দাবি। আমরা হিসেব করে দেখেছি একটি নদীর ২০ (কুড়ি) কিমি দৈর্ঘ্যে, ৫০ মি (১৫০ ফুট) প্রস্থে এবং ১.৫ মি (প্রায় ৫ ফুট) গভীরতায় ড্রেজিং করার খরচ হল ৮৬ (ছিয়াশি) কোটি টাকা। আর ওই ড্রেজিং করা মাটি রাখার জন্য জমি দরকার ১২০ হেক্টর। কাজেই পশ্চিমবঙ্গের মতো ব-দ্বীপ অঞ্চলের নদীগুলিতে নির্বিচারে ড্রেজিং করার খরচ আকাশচুম্বি ও ড্রেজিং করা মাটি রাখার জায়গা পাওয়া একান্তই অসম্ভব।

সংবাদমাধ্যমগুলির কাছে আমাদের আবেদন দেশের ও দশের স্বার্থে বাস্তবভিত্তিক গঠনমূলক সমালোচনা করুন। যে কোনো অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বক্তব্য শুনে আপনাদের অভিমত দিন।

পাঠকের কলম

সম্পাদক সমীপেষু,

ঢাকায় অবস্থিত ভারতীয় হাইকমিশন সেচ ও জলপথ বিভাগ প্রকাশিত আপনাদের বিভাগীয় মুখপত্র 'সেচপত্র' নিয়মিতভাবে পেতে চাইছে। এ ব্যাপারে আপনাদের ডাকযোগে পাঠাবার তালিকায় হাইকমিশনের নামটি রাখলে ও সংখ্যাটি প্রকাশের কর ১০ কপি করে আমাদের কাছে পাঠালে আমরা খুবই আনন্দিত হব। পাঠাবার অসুবিধে থাকলে আমরাও জলসম্পদ ভবন থেকে সংগ্রহ করতে পারি।

নমস্কারান্তে— ভবদীয়

মানব হাঁসদা

উপ-সচিব

পররাষ্ট্র মন্ত্রক, ভারত সরকার

সম্পাদক সমীপেষু,

আপনাদের বিভাগীয় মুখপত্র 'সেচপত্র' আমাদের গ্রন্থাগারে পাঠাবার জন্য ধন্যবাদ। প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য সংখ্যাটি খুবই মূল্যবান।

আপনাদের ডাকযোগে পাঠাবার তালিকায় আমাদের নাম রাখলে প্রকাশের পর ১ কপি করে পাঠালে আমরা খুবই আনন্দিত হব।

ধন্যবাদসহ— ভবদীয়

সি কে মান্না

বিভাগীয় প্রধান

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, বিজ্ঞান বিভাগ

সম্পাদক সমীপেষু,

আপনাদের বিভাগীয় মুখপত্রটি পাঠাবার জন্য ধন্যবাদ। শিক্ষক ও ছাত্রদের পড়ার জন্য পত্রিকাটি আমাদের গ্রন্থাগারে রাখা আছে। যদি ভবিষ্যতেও এভাবে পত্রিকাটি পাঠাবার ব্যাপারে আপনাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন তবে খুবই আনন্দিত হব।

ভবদীয়

সচিব

রামকৃষ্ণ মিশন, বেলঘরিয়া

মহাশয়,

আপনাদের দপ্তর থেকে প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রকাশনাসমূহ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা গ্রন্থাগারে মাননীয় মন্ত্রীবর্গ এবং বিধানসভার সদস্যের ব্যবহারের জন্য পাঠাতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

ভবদীয়

উপ-সচিব

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা

সম্পাদক সমীপেষু,

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগ প্রকাশিত বিভাগীয় মুখপত্র 'সেচপত্র' বন্যা ২০০০ সংখ্যাটি পেয়েছি। এ জন্য ধন্যবাদ। আপনাদের কাছে পত্রিকাটির পরবর্তী সংখ্যাগুলি নিয়মিতভাবে পাঠাবার জন্য অনুরোধ করছি।

ধন্যবাদসহ

এস বি কুলকার্ণি

অতিরিক্ত অধিকর্তা

সি ডব্লু সি,

সি ডব্লু পি আর এস, পুনে

সম্পাদক সমীপেষু,

আপনাদের বিভাগীয় মুখপত্র 'সেচপত্র' নিয়মিতভাবে পাওয়ার ব্যাপারে যদি আমাদের নাম ডাকযোগে পাঠাবার তালিকায় রাখেন তবে আমরা খুবই আনন্দিত হব।

ধন্যবাদসহ ভবদীয়

ম্যানেজার

হিলা টি এস্টেট, জলপাইগুড়ি

সেচপত্র

নিজে পড়ুন, অন্যকে পড়ান

পাঠকের কলমে

আপনার মতামত

জানান

ময়ূরাক্ষী জলাধার

স্বাধীনোত্তর ভারতের একটি অন্যতম বহুমুখী সেচপ্রকল্প

অঞ্জন দাশগুপ্ত

অধীক্ষক বাস্তুকার / সেচ ও জলপথ দপ্তর

১. ভূমিকা

১.১ ১৯৫১ সালের ২৯ জুলাই ময়ূরাক্ষী জলাধার প্রকল্প সূচনার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের জলাধার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সৃষ্টি হয়। দেশের একেবারে প্রথম দিকের অর্থাৎ স্বাধীনতা-উত্তর যুগের বহুমুখী সেচপ্রকল্পের এটি অন্যতম এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকে এই প্রকল্পটি একটি পথিকৃৎ। খরিফ মরশুমে ২,২৬,৭২১ হেক্টর বা ৫,৬০,০০০ একর এবং রবি মরশুমে ২০,২৪২ হেক্টর বা ৫০,০০০ একর জমিতে সেচের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে প্রকল্পটি রূপায়িত হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে বোরো চাষের জন্যও প্রকল্পটি থেকে সেচের জল সরবরাহ করা হয়। উপকৃত জেলাগুলি হল বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান ও বিহার রাজ্যের (ঝাড়খণ্ডের) দুমকা। বীরভূমে সেচসেবিত জমির পরিমাণ মোট প্রকল্পের ৭২%। প্রকল্পটি থেকে ৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনেরও সংস্থান রয়েছে। ময়ূরাক্ষী ও তার উপনদীগুলো যেমন দ্বারকা, ব্রাহ্মণী, বক্রেশ্বর, কোপাই-এর জলসম্পদকে ব্যবহার করে এই জেলাগুলোর তৃষিত জমির সেচের জল চাহিদা মেটাতে এই প্রকল্পটি রূপায়িত হয়েছিল। সর্বাধিক সেচ আওতাধীন জেলা বীরভূম যার কিছু স্থান খরাপ্রবণ অঞ্চল বলে চিহ্নিত করা যায়। গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১৩০৩.৭ মিমি নিয়ে জেলাটিকে রাজ্যের সর্বাপেক্ষা শুষ্ক জেলা বলা হয়। প্রধান বাঁধ, ব্যারেজসমূহ এবং খাল খননের কাজ ১৯৫৫ সালে শেষ হয় এবং সেচের জল সরবরাহ করা আরম্ভ হয় ১৯৫৬ সাল থেকে। প্রকল্পটির কাজ শেষ হয় ১৯৮৫ সালে এবং মোট সেচসেবিত এলাকার প্রায় লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে।

১৯৫৩ সালে প্রকল্পটির আনুমানিক খরচ ছিল ১৬১১ লক্ষ টাকা। অন্তিমকালে খরচ দাঁড়ায় ২০৪৬ লক্ষ টাকা। ১৯৮৫ সালে প্রকল্পটির কাজ শেষ হয়।

২. সংশ্লিষ্ট নদী

২.১ প্রকল্পটির জন্য জলসম্পদ ব্যবহারকারী নদীসমূহের অন্তর্গত হল ময়ূরাক্ষী, কুইয়া, বক্রেশ্বর, কোপাই, মণিকর্ণিকা, ব্রাহ্মণী, গম্ভীরা, দ্বারকা। এরা ময়ূরাক্ষী-বাবলা নদী গোষ্ঠীভুক্ত এবং গঙ্গা-ভাগীরথীর

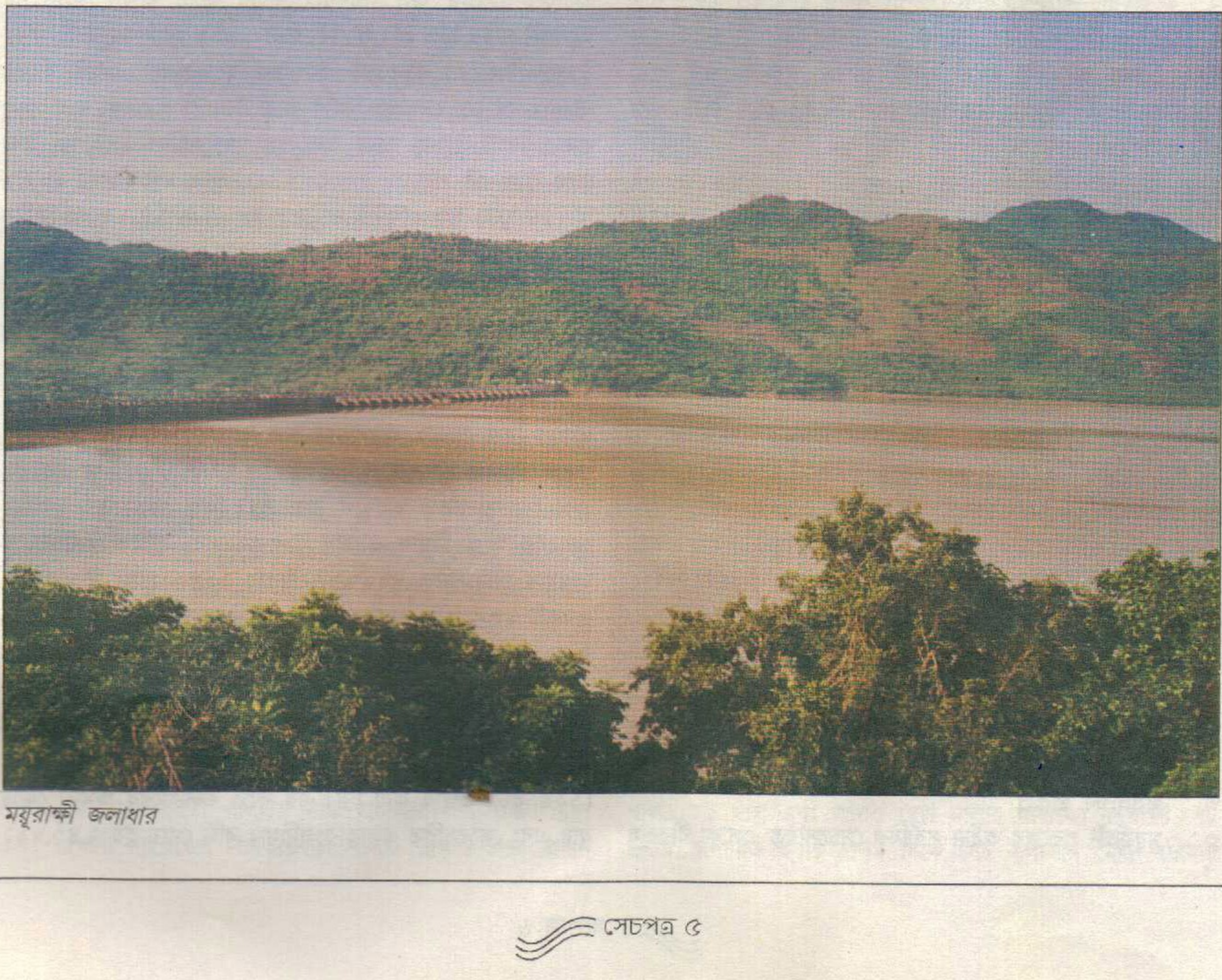

ময়ূরাক্ষী জলাধার

অন্যতম প্রধান উপনদী। এবারে এই নদীর গতিপথ নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক।

ভাগীরথীতে নির্গত হওয়ার আগে পর্যন্ত ময়ূরাক্ষী-বাবলা শ্রেণীভুক্ত নদীসমূহের মোট জলগ্রহ ক্ষেত্রের মোট পরিমাণ ১১,৬৫৫ বর্গ কিমি।

এটিকে এইভাবে উপবিভক্ত করা যায় :-

(ক) মশানজোড় বাঁধের উজানে ১৮৬০ বর্গ কিমি।

(খ) মশানজোড় বাঁধ থেকে তিলপাড়া ব্যারেজ : ১৩৪৯ বর্গ কিমি।

(গ) তিলপাড়া থেকে বাবলাতে নির্গত হওয়া পর্যন্ত : ১৯০০ বর্গ কিমি।

(ঘ) ব্রাহ্মণী-দ্বারকা : ৩৪৪৬ বর্গ কিমি।

(ঙ) পাগলা-বাঁশলই : ২২০০ বর্গ কিমি।

(চ) ভাগীরথীর অন্তবর্তী একটি ক্ষুদ্রাংশ ৯০০ বর্গ কিমি।

মোট : ১১,৬৫৫ বর্গ কিমি।

২.১.১ **ময়ূরাক্ষী**—বিহার রাজ্যের সাঁওতাল পরগনার উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল থেকে নির্গত মতিহারী, ধোব্বি ও পুসারোর সম্মিলিত ধারায় জলপুষ্ট হয়েছে ময়ূরাক্ষী বা মোর। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলায় প্রবেশের আগে ময়ূরাক্ষী সিদ্ধেশ্বরী ও নুনবিলের সম্মিলিত ধারাতে সিক্ত হয়। এর পরে পশ্চিমবঙ্গে ঢোকার পরে ডানদিক দিয়ে খুশকরনি ও বাঁদিক দিয়ে ঘোষবেড়া নামে দুটি ছোট ধারা নদীটির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। এর পরে বীরভূম জেলার সীমানা পেরিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার তলগ্রামে দ্বারকার সঙ্গে মিলিত হয়ে সম্মিলিত প্রবাহ ভাগীরথীতে গিয়ে পড়ছে।

২.১.২ **কুইয়া**—বক্রেশ্বর এবং কোপাই নদীর সম্মিলিত ধারার নাম কুইয়া। সাঁওতাল পরগনার পাহাড়ি স্থান থেকে উৎপত্তি হবার পরে উষ্ণ প্রস্রবণ অতিক্রম করে একটি সর্পিল পূর্বমুখী পথ ধরে, চন্দ্রভাগা ইত্যাদি বীরভূম জেলার দক্ষিণ দিকের ছোট ছোট ধারা এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে।

বিহারের সাঁওতাল পরগনার পূর্বদিকের পাহাড়ে উৎপত্তি হবার পরে প্রায় ৫২ কিমি পথ অতিক্রম করার পরে উত্তরমুখী প্রবাহিত হয়ে কাঁদিপুর নামক স্থানে কোপাই নাম নিয়ে শাল নদীটি বক্রেশ্বরের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে। এর পরে সম্মিলিত ধারাটি কুইয়া নাম নিয়ে আরও কয়েকটি ছোট ধারার সঙ্গে মিলে বীরভূম জেলায় ময়ূরাক্ষী নদীতে নির্গত হচ্ছে।

২.১.৩ **দ্বারকা**—দ্বারকা বা বাবলা একটি সংকীর্ণ ধারা। বছরের সারা সময়ে এটিতে জল থাকে না। বিহারের ছোটনাগপুরের রামগড় পাহাড় থেকে উৎপত্তি হয়ে বীরভূম জেলার মধ্য দিয়ে ৭০ কিমি পথ অতিক্রম করার পথে গম্ভীরা, ঘোড়ামারা ইত্যাদির প্রবাহ যুক্ত হয়ে প্রথমে পূর্বমুখী এবং পরে দক্ষিণমুখী প্রবাহিত হয়ে ময়ূরাক্ষী এবং কুইয়ার সম্মিলিত ধারার সঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলার হিজল বিলে মিলিত হয়ে ভাগীরথীতে নির্গত হচ্ছে।

২.১.৪ **ব্রাহ্মণী**—ব্রাহ্মণী নদীরও উৎপত্তি বিহারের সাঁওতাল পরগনায়। নারায়ণপুরে বীরভূম জেলায় প্রবেশের পরে বাঁদিক দিয়ে ত্রিপিতা নদীর ধারা নিয়ে সাঁকোঘাট নামক স্থানে দ্বারকার সঙ্গে মিলিত হচ্ছে।

৩. ময়ূরাক্ষী প্রকল্প

৩.১ ময়ূরাক্ষী প্রকল্পের অধীন সর্বাধিক সেচসেবিত এলাকা বীরভূম জেলার গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে কম। অতীতে জেলাটি অনেকবারই খরা এবং দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে এবং এর ফলে ফসলের প্রভূত ক্ষতি হয়। ব্রিটিশ শাসনের গোড়ার দিকে এই অজন্মার কারণে বহু গ্রাম বসতিহীন হয়ে পড়ে। ১৭৭১ সালে কৃষিজ জমির প্রায় ⅓ অংশ ফসল উৎপাদনে অক্ষম হয়ে পড়ায় এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়। ১৭৭৬, ১৭৯১ সালের দুর্ভিক্ষও প্রকট আকার ধারণ করে। এর পরেও প্রচণ্ড খরা এবং অনাবৃষ্টির কবলে জেলাটি পড়ে ১৮০০, ১৮০৩, ১৮২৯, ১৮৩৭, ১৮৫৬ এবং ১৮৬৭ সালে।

৩.২ এর থেকে সহজেই অনুমেয় যে বীরভূম জেলা কতটা খরাপ্রবণ। কৃষিজীবীদের এই শোচনীয় অবস্থা লাঘব করতে ১৯২৭ সাল থেকেই চিন্তাভাবনা শুরু হয়। এর প্রথম প্রয়াস নেওয়া হয় ১৯২৮ সালে। তদানীন্তন বাংলার সেচ বিভাগের মুখ্য বাস্তুকার একটি জলাধার প্রকল্পের সপক্ষে মত প্রদান করেন এবং মোর বা ময়ূরাক্ষী প্রকল্পের উপরে গুরুত্ব আরোপ করেন। দুর্ভিক্ষ দূরীকরণকল্পে সরকার বক্রেশ্বর সেচপ্রকল্প তৈরি করার কাজে প্রয়াস নেয়। প্রকল্পটির কাজ শেষ হবার পর কিন্তু দেখা গেল যে প্রস্তাবিত ৩২৩৯ হেক্টর (৮০০০ একর) জমিতে সেচের ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয় জলসম্পদ বক্রেশ্বর নদীর নেই। এর পরে সিউড়ি থেকে ৮ কিমি দূরে খাটাঙ্গায় একটি বাঁধ (weir) নির্মাণ করে ময়ূরাক্ষী নদীর জল বক্রেশ্বরে পাঠিয়ে এই জলাভাব পূরণ করার কথা ভাবা হয়। কিন্তু অন্যান্য স্থানে সেচের প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ করা সম্ভবপর না হওয়ায় প্রকল্পটির যথার্থতা নষ্ট হয়। অপরদিকে বিস্তীর্ণ এলাকায় সেচের জল সরবরাহ করার মতো যথেষ্ট জলসম্পদ ময়ূরাক্ষী নদীর ছিল না। পরবর্তীকালে ১৯৪১ সালে ময়ূরাক্ষী নদীর উজানে বিহারের সাঁওতাল পরগনার মশানজোড়ে একটি বাঁধের (dam) সাহায্যে জলাধার নির্মাণ করে উভয় তীর থেকে খাল খনন করার একটি প্রকল্প রচনা করা হয়। আনুমানিক ২৭২.৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই প্রকল্পের প্রস্তাবনার মধ্যে ছিল মশানজোড়ে ২৯.৮৭ মি (৯৮ ফুট) উচ্চতাবিশিষ্ট অধিপ্রবাহিত (overflow) ড্যাম যেটির জলধারণের ক্ষমতা ৩৫.৭৮৫ হে.মি. (২,৯০,০০০ একর ফুট), খাটাঙ্গায় একটি pick-up weir এবং বিস্তীর্ণ খাল ব্যবস্থার মাধ্যমে নদীর দুপাশের ১,৮৬,৭২১ হেক্টর (৪,৬১,২০০ একর) জমিতে জলসেচন।

৩.৩ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য এই প্রস্তাবটি সাময়িকভাবে স্থগিত থাকে। কিন্তু যুদ্ধের অবসানের পর যুদ্ধোত্তরযুগের উন্নতিকরণের প্রকল্প হিসেবে এই পরিকল্পনার কথাটির উপর ভাবনাচিন্তা শুরু হয় এবং বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু প্রাক্‌যুদ্ধের তুলনায় যুদ্ধোত্তর যুগে নির্মাণ কাজের উপাদান এবং শ্রমিক মূল্য বেড়ে যাওয়ায় আনুমানিক ৭২২৭.৯৫ টাকায় ১৯৪৫ সালে শ্রীমান সিং প্রকল্পটি নতুন করে অনুমোদনের জন্য পেশ করেন।

৩.৪ ১৯৪৫ সালের এই প্রকল্পটি পেশ করার সময় ১৯৪১ সালে তদানীন্তন মুখ্য বাস্তুকার শ্রীএস. সি. মজুমদার কর্তৃক তৈরি করা সংশোধিত প্রস্তাবনার অনেকগুলো অনুমোদনের কথা মনে রেখে বাঁধের উচ্চতা ২৯.৮৭ মি (৯৮ ফুট) থেকে বাড়িয়ে ৩৮.১০ মি (১২৫ ফুট) প্রস্তাব করা হয়। এর ফলে জলাধারের ক্ষমতা বেড়ে যায় এবং সেচসেবিত এলাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২,৪০,৮৯১

হেক্টর (৫,৯৫,০০০ একর)। খাটাঙ্গায় weir-এর বদলে Barrage-এর প্রস্তাব করা হয়।

৩.৫ প্রস্তাবটি পেশ করার সময়ে Barrage এবং খাল ব্যবস্থার কাজ আগে শুরু করতে বলা হয়। কারণ dam এবং জলাধারের অবস্থিতি বিহারের মশানজোড়ে হওয়ায় এই রাজ্যের অনুমোদন না পাওয়া পর্যন্ত এই কাজ আরম্ভ করা সম্ভবপর ছিল না। সরকার অনুমোদিত প্রকল্পটিতে প্রধান Barrageটির অবস্থিতি ছিল সিউড়ি থেকে ৮ কিমি দূরে খাটাঙ্গায়। এর পরে আরও তথ্য অনুসন্ধান এবং নদী বিজ্ঞান মন্দিরের (River Research Institute) গবেষণার ভিত্তিতে নদীর আরও নিম্নমুখে সিউড়ি থেকে ৪ কিমি দূরে তিলপাড়াকে অধিকতর যোগ্য স্থান বলে নির্বাচিত করা হল Barrage নির্মাণের জন্য। CWINC-এর চেয়ারম্যান শ্রী এ. এন. খোসলার স্থানটি পরিদর্শনের পর Barrage-এর নির্মাণকাজ শুরু হয়।

৩.৬ এর পরে বিহার সরকার ড্যাম ও সংশ্লিষ্ট জলাধার নির্মাণ কার্যে সম্মত হয়। ১৯৪৯ সালের ১২ মার্চ তদানীন্তন ভারত সরকারের নির্মাণ, খনি ও শক্তি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এন. ভি. গ্যাডগিলের উপস্থিতিতে ড্যাম ও জলাধার নির্মাণের ব্যাপারে সাধারণ নীতিসমূহ এবং জনসাধারণের পুনর্বাসন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ এবং তৎকালীন বিহার সরকারের মধ্যে বিশদ আলোচনা হয়।

৩.৭ ১৯৫৩ সালের ৩১ জুলাই আনুমানিক ১৬১১.২৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি অনুমোদন পায়। এটি প্রধান দুটি অংশে বিভক্ত।

প্রথম অংশ : ড্যাম ও জলাধার	—৫৪০.৮০ লক্ষ টাকা
দ্বিতীয় " : ব্যারেজ ও খালসমূহ	—১০৭০.৪৪ " "
মোট	১৬১১.২৪ " "

৩.৮ নির্মিত প্রকল্পটির প্রধান অঙ্গগুলি হল—(ক) বিহারের সাঁওতাল পরগনা জেলার দুমকা পাহাড়ের আর্কিয়ান ভূখণ্ডের পাথরের (৫০ কোটি বছর পুরানো) উপরে মশানজোড়ে ময়ূরাক্ষী নদীতে ড্যাম ও সংশ্লিষ্ট জলাধার (খ) এই নদীর উপরেই মশানজোড়ের ৩০ কি.মি. নীচে তিলপাড়ায় প্রধান ব্যারেজ (গ) প্রধান দুটি খাল ব্যবস্থা : উত্তরমুখী খাল বা ময়ূরাক্ষী-দ্বারকা-প্রধান খাল এবং দক্ষিণমুখী খাল বা ময়ূরাক্ষী-বক্রেশ্বর প্রধান খাল। ড্যামের কাছে ময়ূরাক্ষী নদীর তীর বরাবর ভূখণ্ডের উচ্চতা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ৯১.৪৪ মি. (৩০০ ফুট) উপরে। তিলপাড়ার উচ্চতা ৬১ মি. (২০০ ফুট) সমোন্নত রেখার (Contour line) তলায় এবং Barrageটি প্রায় ২০ ফুট জল উন্নীত করে। এর ফলে ময়ূরাক্ষী খাল ব্যবস্থার মাধ্যমে ২২০ ফুটের চেয়ে উচ্চবর্তী স্থানে সেচের জল সরবরাহ করা সম্ভব নয়। এ ছাড়া কোপাই, দ্বারকা ও ব্রাহ্মণী নদীর উপরে রয়েছে পৃথক পৃথক ব্যারেজ। আগেকার বক্রেশ্বর weir এবং এই খাল প্রকল্পের অঙ্গীভূত হয়। কাদিশালায় অবস্থিত বক্রেশ্বর নদীর উপরে এই weirটি ১৯২৮-৩০ সালের মধ্যে তৈরি করা হয়েছিল। বর্তমানের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী এটিকে পুনর্গঠন করা হয়। ব্রাহ্মণী, কোপাই এবং দ্বারকা ব্যারেজের অবস্থিতি যথাক্রমে বইদারা, কুলতোর এবং দেওচায়। একটি ব্যারেজকে পরেরটির সঙ্গে খাল দিয়ে যুক্ত করা রয়েছে। দ্বারকা ব্যারেজের বামতীরবর্তী খালটির নাম দ্বারকা-ব্রাহ্মণী প্রধান খাল এবং ব্রাহ্মণী ব্যারেজের বামতীরবর্তী খালটি ব্রাহ্মণী-উত্তর প্রধান খাল। অন্যদিকে দক্ষিণে বক্রেশ্বর weir-এর দক্ষিণ তীরবর্তী খালটির নাম হল বক্রেশ্বর-কোপাই প্রধান খাল এবং কোপাই ব্যারেজের বামতীরবর্তী খালটি হল কোপাই দক্ষিণ প্রধান খাল।

৩.৯ ব্যারেজসমূহ ছাড়াও বহু সংখ্যক ছোট-বড় খাল-নিকাশী নালা সংযোগ (cross-drainage), খালপ্রপাত, নিয়ন্ত্রক ইত্যাদি শাখা খাল এবং অন্যান্য ছোট খালের উপরে নির্মিত হয়েছে। এদের মোট সংখ্যা প্রায় ১৮৮০।

৩.১০ প্রকল্পের অধীন মোট শাখা খাল এবং বিভাজক খালের মোট দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৩৬১ ও ১২৬১ কি.মি.। এবারে খালগুলোর গতিপ্রকৃতি নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। উত্তর তীরবর্তী প্রধান খালটিকে জমির প্রাকৃতিক ঢাল অনুযায়ী উত্তর-উত্তরপূর্বমুখী ভাবে খনন করা হয়েছে। অন্যদিকে দক্ষিণ তীরবর্তী প্রধান খালটিও জমির স্বাভাবিক ঢাল অনুসরণ করে ইলামবাজার পর্যন্ত গিয়ে পূর্বমুখী ঘুরে গেছে। অধিকাংশ শাখা খালই প্রধান খালের থেকে লম্ব অভিমুখী এবং পূর্বদিকে প্রসারিত ; তবে বিভাজক খালের গতিমুখ উত্তর-পূর্ব বা দক্ষিণ-পূর্বমুখী। এর ফলে পুরো খালব্যবস্থাটি একটি বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা সদৃশ। প্রধান খালটির পশ্চিম দিকের ভূমির উচ্চতা অধিকতর হওয়ায় সেচের জল থেকে বঞ্চিত। যেমন রাজনগর, খয়রাশোল, দুবরাজপুর, ইলামবাজার, সিউড়ি, মহম্মদবাজার, রামপুরহাট, মুরারই, নলহাটি থানার পশ্চিমদিক এই সেচ প্রকল্পের আওতার বাইরে।

৪. সেচসেবিত এলাকা

৪.১ একটি বিস্তীর্ণ স্থান জুড়ে রয়েছে ময়ূরাক্ষী সেচ প্রকল্পের আওতাধীন জমি। উত্তরে পাগলা, দক্ষিণে অজয় নদের এর সীমানা পর্যন্ত ; আবার পূর্বদিকে এর বিস্তৃতি দ্বারকা বা বাবলা, সাগরদিঘির উচ্চতর জমি, নবগ্রাম থানা এবং পশ্চিমদিকে প্রায় পাহাড়ের

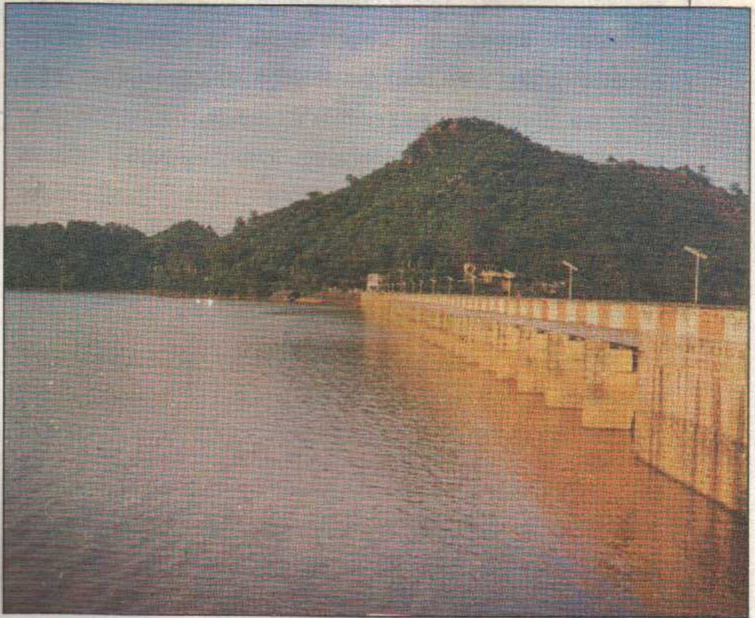

মশানজোড় ড্যাম

পাদদেশ পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি। ময়ূরাক্ষী সেচ প্রকল্পের এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সেচের জল পাঠানো হয় বিভিন্ন প্রধান শাখা, বিভাজক খাল, ছোট খাল এবং আরও ছোট নালার মাধ্যমে। ময়ূরাক্ষী সেচ প্রকল্প রূপায়িত হবার প্রথম দিকে সেচ এলাকার মোট পরিমাণ

৩২১২ বর্গকিমি (১২৪০ বর্গমাইল) বলে ধারণা করা হয়েছিল। জেলাভিত্তিক এই সেচসেবিত এলাকার পরিমাণ ছিল এরকম :

জেলা	মোট সেচ এলাকা	
	বর্গ কি.মি.	বর্গ মাইল
বীরভূম	২২০৯	৮৫৩
মুর্শিদাবাদ	৮০৬	৩১১
বর্ধমান	১৯৭	৭৬
মোট	৩২১২ (৩,২১,০০০ হেক্টর)	১২৪০ (৭,৯৩,৫১০ একর)

৪.২ মোট সেচ এলাকার ৭৫% কে কৃষিযোগ্য সেচজমি বলে ধরা হলে এর পরিমাণ দাঁড়ায়। ২,৪০,৯০০ হেক্টর বা ৫,৯৫,১৩৩ একর।

৪.৩ কৃষিযোগ্য সেচ এলাকার সঠিক নিরূপণে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি কমিটি তৈরি করে। এই কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিছু কিছু স্থানে জমির বন্ধুরতার কারণে এই সেচ এলাকার পরিমাণ কমিয়ে ২,১২,৫৫১ হেক্টর বা ৫,২৫,০০০ করা হয়। কারণ অভিকর্ষ উপায়ে অনেক উঁচু জায়গায় সেচের জল পাঠানো সম্ভবপর ছিল না এবং ময়ূরাক্ষী-বক্রেশ্বর খালের ১নং বিভাজক খালের কাজ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছিল। এর অধীনে সেচ এলাকার পরিমাণ ১০,৯৩১ হেক্টর (২৭,০০০ একর)। এ ছাড়া ২৪২৯ হেক্টর (৬০০০ একর) পরিমাণ বানভাসি জমিকে সেচ এলাকার বাইরে রাখা হয়েছিল।

৪.৪ পরবর্তীকালে বিভাজক খালটির খননের ফলে সেচসেবিত এলাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২,২৬,৭২১ হেক্টর (৫,৬০,০০০ একর)। রবি মরশুমে সেচসেবিত এলাকার পরিমাণ ৪৮,৫৮৩ হেক্টর (১,২০,০০০ একর) থেকে কমিয়ে ২০,২৪৩ হেক্টর (৫০,০০০ একর) করা হয়।

৪.৫ জেলাভিত্তিক এই কৃষিযোগ্য সেচ এলাকার পরিমাণ এইরকম :

জেলা	খরিপ	রবি	মোট
বীরভূম	১,৬০,৯৩১	১৬,২১০	১,৭৭,১৪১
মুর্শিদাবাদ	৪৯,৭৯৭	৪০৩৩	৫৩,৮৩০
বর্ধমান	১৫,৯৯৩	—	১৫,৯৯৩
মোট	২,২৬,৭২১	২০,২৪৩	২,৪৬,৯৬৪

৪.৬ ময়ূরাক্ষী সেচ প্রকল্পের অধীনে সর্বাধিক সেচসেবিত জেলা বীরভূম। মোট সেচ এলাকার ৭২% বীরভূমে, ২২% মুর্শিদাবাদে এবং ৬% বর্ধমান জেলায়।

৪.৭ মূল প্রকল্প রচনায় বোরো চাষের জন্য সেচের জল সরবরাহের কোনো পরিকল্পনা না থাকলেও সেচ এলাকাতে বোরো ধানের চাষ করা হয়। তবে এই বোরো চাষের জন্য জল সরবরাহ সম্পূর্ণভাবে জলাধারে লব্ধ জল প্রাপ্তি এবং রবি মরশুমে জলের চাহিদা মেটানোর উপর নির্ভরশীল। তবে ভাল ফসল প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকায় সেচ এলাকায় কৃষিজীবীদের মধ্যে বোরো ধান চাষ করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। তবে জলাধারে লব্ধ জলের উপরে বোরোর জল সরবরাহ নির্ভর করার ফলে বোরো চাষের সেচ এলাকার পরিমাণ বছর বছর পরিবর্তিত হয়। বিভিন্ন বছরে এই পরিমাণ লক্ষ করলেই এই পরিবর্তনের চিত্রটা পরিষ্কার হয়ে উঠবে। ১৯৯৫-৯৬-এর বোরো মরশুমে যেখানে সেচের জল সরবরাহ করা হয় সর্বাধিক ৩০,৩৬৪ হেক্টর পরিমাণ জমিতে ১৯৮১-৮২-তে এর পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন ৩৩৬৫ হেক্টর। আবার ১৯৭২-৭৩, ১৯৭৬-৭৭ এবং ১৯৮২-৮৩, ১৯৮৮-৮৯, ১৯৯২-৯৩, ১৯৯৪-৯৫ এবং ১৯৯৬-৯৭-এর বোরো মরশুমে আদৌ কোনো জল সরবরাহই করা হয়নি। বোরো মরশুমে সেচের জল সরবরাহ শুরু হয় ১৯৭১-'৭২ সাল থেকে।

৫. সেচ অঞ্চল

৫.১ ময়ূরাক্ষী সেচ প্রকল্পের অধীন সেচ এলাকাকে কয়েকটি অববাহিকা বা অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়। এই অঞ্চলগুলি পরস্পর প্রাকৃতিক সীমারেখা দ্বারা বিভক্ত।

৫.২ ময়ূরাক্ষী নদীর উত্তর দিকের সেচ এলাকা

ক অঞ্চল—ব্রাহ্মণী-পাগলা অববাহিকা অর্থাৎ পাগলা ও ব্রাহ্মণী নদীর মধ্যবর্তী সেচ এলাকা অঞ্চল—এটি ব্রাহ্মণী উত্তর প্রধান খাল ব্যবস্থার অধীন ; মোট সেচ এলাকা—৩৬,৪৩৭ হেক্টর, কৃষিযোগ্য সেচ এলাকা—২৯,৯৬০ হেক্টর।

খ অঞ্চল—দ্বারকা-ব্রাহ্মণী অববাহিকা অর্থাৎ ব্রাহ্মণী ও দ্বারকা নদীর মধ্যবর্তী সেচ এলাকা অঞ্চল—এটি দ্বারকা-ব্রাহ্মণী প্রধান খাল ব্যবস্থার অধীন : মোট সেচ এলাকা—৪২,৪৯৪ হেক্টর, কৃষিযোগ্য সেচ এলাকা—৩১,১৭৪ হেক্টর।

গ অঞ্চল—ময়ূরাক্ষী-দ্বারকা অববাহিকা অর্থাৎ দ্বারকা ও ময়ূরাক্ষী নদীর মধ্যবর্তী সেচ এলাকা অঞ্চল। এটি ময়ূরাক্ষী-দ্বারকা প্রধান খাল ব্যবস্থার অধীন। মোট সেচ এলাকা ৮৮,০৩২ হেক্টর, কৃষিযোগ্য সেচ এলাকা—৫৪,১৫০ হেক্টর।

৫.৩ ময়ূরাক্ষী নদীর দক্ষিণদিকের সেচ এলাকা

ঘ অঞ্চল—ময়ূরাক্ষী-বক্রেশ্বর অববাহিকা অর্থাৎ ময়ূরাক্ষী ও বক্রেশ্বর নদীর মধ্যবর্তী সেচ এলাকা অঞ্চল। এটি ময়ূরাক্ষী-বক্রেশ্বর প্রধান খাল ব্যবস্থার অধীন। এর অন্তর্গত মোট সেচ এলাকা ৩৯,৩৯৩ হেক্টর, কৃষিযোগ্য সেচ এলাকা ৩১,০৭৩ হেক্টর।

ঙ অঞ্চল—কোপাই-বক্রেশ্বর অববাহিকা অর্থাৎ কোপাই ও বক্রেশ্বর নদীর মধ্যবর্তী সেচ এলাকা অঞ্চল। এটি বক্রেশ্বর-কোপাই প্রধান খাল ব্যবস্থার অধীন। এর অন্তর্গত মোট সেচ এলাকা ২৭,৬৯২ হেক্টর, কৃষিযোগ্য সেচ এলাকা ১৮,২১৮ হেক্টর।

চ অঞ্চল—কোপাই-অজয় অববাহিকা অর্থাৎ কোপাই ও অজয় নদীর মধ্যবর্তী সেচ এলাকা অঞ্চল। এটি কোপাই দক্ষিণ প্রধান খাল ব্যবস্থার অধীন। এর অন্তর্গত মোট সেচ এলাকা ৮৭,২১১ হেক্টর, কৃষিযোগ্য সেচ এলাকা ৬২,১৪৬ হেক্টর।

৫.৪ এটি ছটি সেচ অঞ্চলের মধ্যে গ অঞ্চলটির আয়তন সর্বাধিক এবং ঙ অঞ্চলটি ক্ষুদ্রতম।

৬. সেচসেবিত স্থানে বৃষ্টিপাতের প্রকৃতি

৬.১ ময়ূরাক্ষী প্রকল্পের অধীন সেচসেবিত স্থানে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৩০৩.৭ মিমি, এই সেচসেবিত স্থানের

বেশিরভাগটাই বীরভূম জেলায়। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বর্ষাকালেই ৭৬% বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক বরাবর বৃষ্টিপাত ক্রমশ কমে আসে। ১৯০১ থেকে ১৯৫০ এই অর্ধশতাব্দী সময়কালের মধ্যে ১৯১৭ সালে বীরভূম জেলায় গড় বার্ষিক এর থেকে ৪০% বেশি বৃষ্টিপাত হয়। সেচসেবিত এলাকার ভিতরে এবং নিকটবর্তী অঞ্চলে বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টি পরিমাপক ব্যবস্থা আছে। সেচসেবিত এলাকার ব্যাপ্তি খুব বড়ো হওয়ায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও ঘনত্বের মধ্যে তারতম্য বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। প্রায়শই দেখা যায় যে কোনো একটি স্থান যখন অতিবৃষ্টি এমনকী বন্যার কবলে, তখন অন্য একটি অংশ হয়ত খরার শিকার।

৬.২ **বৃষ্টি পরিমাপক স্থান**

বীরভূম জেলা	মুর্শিদাবাদ জেলা	বর্ধমান জেলা
১। সিউড়ি	১। কান্দী	১। কাটোয়া
২। দেওচা	২। জঙ্গীপুর	
৩। রামপুরহাট	৩। খরগ্রাম	
৪। বোলপুর	৪। সালার	
৫। নলহাটি		
৬। মহম্মদ বাজার		
৭। সাঁইথিয়া		
৮। কুলি		
৯। ময়ূরেশ্বর		
১০। কীর্ণাহার		

৬.৩ ময়ূরাক্ষী জলগ্রহক্ষেত্র এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ১৯৫৬, ১৯৫৯, ১৯৭৮, ১৯৯৫, ১৯৯৯ এবং ২০০০ বছরগুলি প্রভূত পরিমাণ বৃষ্টিপাত বছর বলে পরিগণিত হয়। এর মধ্যে ১৯৯৯-২০০০ সাল দুটি ছিল অভূতপূর্ব। মাসাঞ্জোরে তিনদিনে মোট ৪৬৫.৬ মিলি বৃষ্টি হয়। এর মধ্যে ২৫.৯.৯৯-এ একদিনেই ৩৩০.২ মিমি বৃষ্টি পরিমাপ করা হয় যেটি আগে কখনও হয়নি। এর পর ২০০০ সালে ১৮.৯ থেকে ২১.৯ এই চারদিনে মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল ৮৬৯ মিমি, যেটি অভূতপূর্ব। সিউড়িতে ১৯.৯.২০০০ যে চব্বিশ ঘন্টায় ৬১৮ মিমি বৃষ্টি হয়, সেটি ১২৫ বছরের ইতিহাসে সর্বাধিক।

৭. **সেচসেবিত এলাকায় বন্যার ঘটনা**

৭.১ ১৯৫৬, ১৯৫৯, ১৯৭৮, ১৯৯৫, ১৯৯৯ এবং ২০০০ সালে ময়ূরাক্ষী অববাহিকায় প্রভূত পরিমাণ বৃষ্টিপাতের ফলে ব্যাপক বন্যা হয়।

৭.২ ইতিহাসের পাতা ওলটালে দেখা যায় যে ময়ূরাক্ষী প্রকল্প হবার আগে ময়ূরাক্ষী অববাহিকা অঞ্চলে বিরাট মাপের বন্যার বিশেষ নিদর্শন নেই। এর মধ্যে কেবল দুবছর ১৭৮৭ ও ১৯০২ সালে এই অঞ্চলে বড় আকারের বন্যা হয়েছিল বলে জানা যায়। তবে কান্দী, ভরতপুর, বড়এঞা ইত্যাদি স্থানে বিভিন্ন বছরে বৃহদায়তন প্লাবনের ঘটনা রয়েছে। এই অঞ্চলগুলো অবশ্য মশানজোড় বাঁধের নিচের দিকে অবস্থিত।

৭.৩ মশানজোড় বাঁধ মূলত নির্মিত হয়েছিল বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ জেলার তৃষিত জমিতে সেচের জল সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে। উচ্চতা বৃদ্ধি করতে গেলে তদানীন্তন বিহার রাজ্যে আরও বেশি জমি অধিগ্রহণের প্রশ্ন জড়িত ছিল। মশানজোড় বাঁধ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলটির আয়তন ময়ূরাক্ষীর সম্পূর্ণ অববাহিকার ভাগীরথীতে নির্গত হবার স্থানের কেবলমাত্র ১৫.৯৬ শতাংশ।

৭.৪ বন্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মশানজোড় বাঁধের ভূমিকা বীরভূম জেলার ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত বিবরণপঞ্জীতে যথার্থভাবে রূপায়িত হয়েছিল :

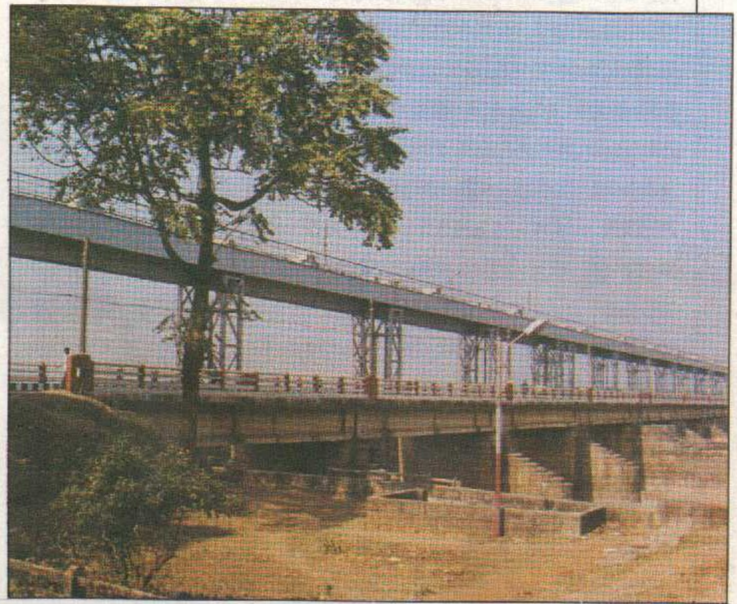

তিলপাড়া ব্যারেজ

"কোপাই, বক্রেশ্বর, ময়ূরাক্ষী, দ্বারকা, ব্রাহ্মণী এবং তাদের অসংখ্য উপনদী, শাখানদী যেগুলো কান্দী মহকুমার হিজল বিল এবং অন্যান্য বিলে তাদের জলরাশি ঢেলে দেয় সেই অববাহিকার মোট আয়তন ৪৫০০ বর্গ মাইল বা ১১,৬৫৫ বর্গ কিমি. এর মধ্যে মশানজোড় বাঁধ কেবলমাত্র ৭১৮ বর্গ মাইল বা ১৮৬ বর্গ কিমি অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করে। এর থেকে এটা সহজেই অনুমেয় যে মশানজোড় বাঁধের উজানের সমস্ত প্রবাহ যদি জলাধারে সঞ্চিত করে রাখা যেত, ,এর প্রভাব সম্পূর্ণ অববাহিকার তুলনায় নগণ্য। সম্ভবত এই কারণবশতই ময়ূরাক্ষী প্রকল্পের জলাধারে বন্যার জন্য কোন জলভাণ্ডারের ব্যবস্থা রাখা হয়নি।"

৭.৫ ১৯৯৯ এবং ২০০০ সালে ময়ূরাক্ষী অববাহিকায় ঐতিহাসিক বন্যা হয়। অন্যান্য বছরের বন্যাকে এই প্লাবনের ঘটনা সম্পূর্ণভাবে ম্লান করে দেয়।

৭.৬ মশানজোড়ে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯-এর ঐতিহাসিক বন্যা

৭.৬.১ ১৯৯৯ সালের ২৩-২৫ সেপ্টেম্বর এই তিনদিনের মধ্যে ময়ূরাক্ষী জলগ্রহ ক্ষেত্রে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় যেটি ১৯৫৬, ১৯৫৯, ১৯৭৮ এবং ১৯৯৫-এর তিনদিনব্যাপী বৃষ্টিপাতের পরিমাণকেও বিপুলভাবে ছাপিয়ে যায়। এ ধরনের বৃষ্টিপাতের নজির ১৮৯৮ সালেই পরিলক্ষিত হয়।

৭.৬.২ এই প্রভূত বৃষ্টিপাতের কারণে ময়ূরাক্ষী নদীর জলমাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ময়ূরাক্ষী জলাধারের সর্বাধিক জল সংরক্ষণ স্তর

১২১.০০ মি. (৩৯৮.০০ ফুট)। একটি বিরাট আকারের বন্যার আশঙ্কা করে ২৩.৯ তারিখে সকাল সাড়ে নটা থেকে জলকপাটের পরিচালন শুরু হয়ে যায়। এই সময় থেকেই একটি একটি করে কপাট খুলে দেওয়া হয়। জলাধারে তখন জলস্তর ছিল ১১৯.৮৫ মি. (৩৯৩.২০ ফুট)। জলস্তর দ্রুতগতিতে বাড়তে বাড়তে ১২১.৫৩ মি. (৩৯৮.৭০ ফুট)-এ পৌঁছায় যেটি সর্বাধিক জল সংরক্ষণ স্তরের থেকে ০.২১ মি. (০.৭০ ফুট) বেশি। ২১টি প্রবহ অংশের জলকপাটের মধ্যে ২০টি এবং ৬টি নিম্ন জলকপাট জল নির্গমনের জন্য সম্পূর্ণভাবে খুলে দেওয়া হয়। তোলার সময়ে একটি প্রবহ কপাটে কিছু গোলমাল দেখা দেয় এবং একটি চালু করা সম্ভব হয় ওঠেনি। নীচের দিকে ব্যারেজের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বন্যার পরিমাণ জলাধারে ক্রমাগত জলস্তরের উন্নতির ভিত্তিতে ২৩.৯-এর সকাল ৯টা থেকে ২৬.৯-এর রাত বারোটা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জলাধারে আগত জলের পরিমাণ প্রতি আধঘণ্টা অন্তর পরিমাপ করা হচ্ছিল। ২৫.৯-এ সকাল ৭টা থেকে সাড়ে ৭টার মধ্যে এর সর্বাধিক পরিমাণ ছিল ১১,৭৪২ কিউমেক (৪,১৪,৬২০ কিউসেক)। জলকপাট খুলে দিয়েও জলাধারে জলস্তর ১২২.৮৭ মি. (৪০৩.১০ ফুট)-এ পৌঁছায়। মশানজোড় বাঁধের ৪৫ বছরের ইতিহাসে এটিই ছিল সর্বাধিক। ওই দিনই সকাল দশটা থেকে দুপুর বারোটার মধ্যে সর্বোচ্চ ৫৮৭৭ কিউমেক (২,০৭,৫০০ কিউসেক) জল ছাড়া হয়।

৭.৬.৩ ২৪ সেপ্টেম্বর তারিখের সকাল আটটা থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর রাত বারোটা পর্যন্ত ময়ূরাক্ষী জলাধারে মোট প্রবাহিত জলের পরিমাণ গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ৬৭,০৯৯ হে.মি. (৫,৪৩,৭৬৮ একর ফুট)। এই বাঁধ পরিচালনের ৪৫ বছরের ইতিহাসে এটিই ছিল সর্বাধিক।

৮. সেচসেবিত এলাকার ফসলের বৈশিষ্ট্য

৮.১ ময়ূরাক্ষী সেচ প্রকল্পের অধীন কৃষিজমিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায় (ক) উচ্চজমি বা উন্নত সমোন্নত অঞ্চল, (খ) মাঝারি উঁচুজমি, (গ) নিচুজমি বা নিম্ন সমোন্নত অঞ্চল।

৮.২ উচ্চজমির মৃত্তিকার জলধারণের ক্ষমতা কম আবার মাঝারি উঁচু জমিতে খরিফ শস্য চাষের পর ভূগর্ভস্থ মাটির জলসিক্ততা ভূপৃষ্ঠ থেকে ০.৩০ মিটার (১ ফুট)-এর মধ্যে থাকে।

৮.৩ সেচসেবিত এলাকার প্রায় সর্বত্রই খরিফ মরশুমে সাবেকি এবং উচ্চ ফলনশীল দু প্রকারেরই আমন ধান প্রভূত পরিমাণে জন্মায়। এ ছাড়া পাট এবং বর্ষার সবজিরও ভাল ফলন হয়। রবি মরশুমের প্রধান ফসলগুলো হল আলু, গম, মটর, সূর্যমুখী তৈলবীজ, আখ, ডাল, শীতকালীন সবজি। জলের পরিমাণের প্রাপ্তি অনুযায়ী গ্রীষ্মকালে সেচসেবিত এলাকায় বোরো ধানের চাষও হয়ে থাকে।

৯। জলবিদুৎ উৎপাদন

৯.১ প্রকল্পটিতে ৪ মেগাওয়াট বিদুৎ উৎপাদনের সংস্থান রয়েছে। শুখা মরশুমে নদীতে জলপ্রবাহ কমে যাওয়ায় বিদুৎ উৎপাদন ব্যাহত হয়। তাই খরিফ মরশুমে সেচের প্রয়োজনীয় জল সরবরাহের পর অবশিষ্ট জলের উপরে এই উৎপাদন নির্ভরশীল। সেচের জলের পরিমাণ কমানো সম্ভব না হওয়ায় এবং শুখা মরশুমে রবি চাষের জন্য প্রয়োজনীয় জল ধরে রাখার পরে জলাধারের সঞ্চিত জল থেকে ২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হয়। এইরকম উৎপাদনবিশিষ্ট দুটি ইউনিট রয়েছে। শুখা মরশুমে একটিকে চালু রেখে অন্যটির প্রয়োজনীয় মেরামতির কাজ করা হয়। বর্ষার সময়ে অবশ্য জলাধারে অধিক জল সঞ্চিত থাকায় দ্বিতীয়টি থেকে মরশুমি বাড়তি বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।

১০. বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে জল সরবরাহ

১০.১ পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম (WBPDCL) বীরভূম জেলার তাপাসপুরে (সিউড়ি থেকে সাত কি.মি. দূরে) ৫ × ২১০ মেগাওয়াট বিশিষ্ট তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ সম্পাদন করছে। ১৯৮৮ থেকে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। প্রকল্পের Cooling tower, বিদ্যুৎ উৎপাদক ইউনিট, কয়লা পরিচালন (coal handling plant), গৃহস্থালী এবং অন্যান্য বহুল প্রয়োজনে জলের চাহিদা অনেক। এই প্রভূত পরিমাণ জলের চাহিদা মেটাতে বছরের ৯ মাস ময়ূরাক্ষী সেচ প্রকল্পের অধীন তিলপাড়া ব্যারেজ থেকে ১.৯০ কিউমেক (৬৭ কিউসেক) জল সরবরাহ করার চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। বছরের বাকি তিন মাস অর্থাৎ এপ্রিল থেকে জুনে বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম বক্রেশ্বর নদীর উপরে বাঁধ তৈরি করে সৃষ্ট জলাধার থেকে প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

১০.২ বীরভূম জেলার নানুর, লাভপুর, ইত্যাদি ব্লক যেখানে এর ফলস্বরূপ জলের ঘাটতি দেখা দেবে, সেখানে ভূগর্ভস্থ জলের সাহায্যে গভীর নলকূপ খননের মাধ্যমে এই প্রয়োজন মেটানো হয়। তাপবিদ্যুৎ উন্নয়ন সংস্থা এর ব্যয়ভার বহন করবে। এই গভীর নলকূপগুলোর স্থান নির্বাচনের দায়িত্বে আছে রাজ্য জল অনুসন্ধান দপ্তরের উপরে (SWID)।

১১. সেচসেবিত এলাকার উন্নতিকরণ

১১.১ সেচবিভব সৃষ্টি এবং তার ব্যবহারের মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে আনা, জমি ও জলসম্পদের যথার্থ ব্যবহার করে কৃষি উৎপাদনের উন্নতিকল্পে ১৯৭৪-৭৫ কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত সেচসেবিত এলাকা উন্নতিকরণ সংস্থার (CADA) অধীনে ময়ূরাক্ষী সেচ এলাকা উন্নতিকরণ ব্যবস্থা আত্মপ্রকাশ করে। ময়ূরাক্ষী সেচ প্রকল্পের বিভিন্ন নির্গমকের (outlet) মাধ্যমে বের করে দেওয়া জলের সাহায্যে পাকা ও কাঁচা নালা নির্মাণ করে ৫ থেকে ৮ হেক্টর পর্যন্ত কৃষিজমিতে সেচের জল পাঠাবার বন্দোবস্ত করে CADA সেচবিভবের যথার্থ সদ্ব্যবহারে প্রয়াস নিয়েছে। এর পরে আরও ছোট জমিতে জল নিয়ে যাবার জন্য নিজেদের অর্থব্যয়ে কৃষিজীবীদের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছে।

১২. খাল ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ

১২.১ ময়ূরাক্ষী সেচ প্রকল্পের অধীন প্রধান খাল, শাখা খাল, বিভাজক খাল এবং অন্যান্য ছোট খালসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ দপ্তরের, তবে CADA-র খনন করা ছোট ছোট নালার দায়িত্ব এই সংস্থার।

১৩. মশানজোড় বাঁধের রক্ষণাবেক্ষণ

১৩.১ ১৯৫৬ সালে মাসাঞ্জোর বাঁধ তৈরি হবার পর ৪৫ বছর সময়কাল অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। প্রতি বছরেই বাঁধের সাধারণ রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়ে থাকে। তবে কয়েক বছর ধরে তাপ ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার কারণে বাঁধের মধ্যেকার ২৩ সেমি ব্যাসবিশিষ্ট

নিকাশি বিবরমুখের অনেক স্থান অবরুদ্ধ হওয়ায় নিকাশি ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটে। পরবর্তী বছরগুলোতে অবস্থার আরও অবনতি ঘটতে থাকে।

১৩.২ বাঁধের নিম্নবর্তী অঞ্চলের বিস্তীর্ণ স্থানে বছরের পর বছর সেচের জল জুগিয়ে বাঁধটি সবুজ বিপ্লব ঘটিয়েছে। সেজন্য এর যথার্থ রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। এই অসুবিধে দূরীকরণের যথার্থ প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহর করা হয়েছে।

১৪. বিহার রাজ্যে সেচের জল সরবরাহ

১৪.১ বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী ময়ূরাক্ষী সেচ প্রকল্পের কাজ রূপায়িত করার সময়ে খরিফ মরশুমে ১০,১২০ হেক্টর জমিতে সেচের জল সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। প্রতি বছর ২৫ অক্টোবর লব্ধ ব্যবহারকারী জলসম্পদের $\frac{১}{২৪}$ অংশ পরিমাণ জল বিহারে (বর্তমান ঝাড়খণ্ড) রবি বোরো মরশুমে চাষের জন্য নির্ধারিত হয়েছিল।

১৪.২ আগে ১৯৬০ সালে নৌকার উপরে স্থিত হাঙ্গেরীয় ডিজেল পাম্পের সাহায্যে এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তবে পুরনো এবং অনেকদিন ধরে ব্যবহারের কারণে, এই পাম্পগুলোকে আর মেরামতি করা সম্ভবপর ছিল না। এর ফলে বাঁধের ১০৬.৪০ মি (৩৪৯.০০ ফুট) জলতল থেকে ১১১.২৮ মি (৩৬৫.০০ ফুট) জলতল এর মধ্যবর্তী পরিমাণ জল কোন বছরই কাজে লাগানো যাচ্ছিল না।

১৪.৩ বিভিন্ন বছরের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, খরিফ মরশুমে জল সরবরাহে কোনো সমস্যা দেখা দেয় নি। তবে রবি/বোরো মরশুমে প্রয়োজনীয় জল সরবরাহে অসুবিধে দেখা দিয়েছে। বর্ষাকালের পরে বা আগের সময়ে জলস্তরকে ১১১.২৮ মি. (৩৬৫.০০ ফুট)-এর নীচে নামানো সম্ভবপর হচ্ছে না যেখানে বিহার খালের নিম্নস্তরটি ১০৯.৭৬ মি. (৩৬০.০০ ফুট)।

১৪.৪ এই অসুবিধে দূরীকরণের জন্য নৌকার উপরে অধিষ্ঠিত চারটি বৈদ্যুতিক পাম্প, মোটর, জলবাহী নল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

১৫. উপসংহার

১৫.১ স্বাধীনতা-উত্তর যুগে ভারতবর্ষের বহুমুখী সেচ প্রকল্পের অন্যতম পথিকৃৎ ময়ূরাক্ষী জলাধার প্রকল্প বিগত ৪৫ বছর ধরে রাজ্যের খরা এবং আংশিক খরাকবলিত জেলার তৃষিত জমিতে সেচের জল জুগিয়েছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সময়কালেই এর প্রধান কাজগুলোই শেষ হয়ে যায় এবং সেচের জল সরবরাহ শুরু হয়। ফলে কৃষি উৎপাদন বেড়েছে বিপুলভাবে। ঘটেছে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন।

১৫.২ সেচের জল ছাড়াও বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বছরে ন-মাস কাল বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং অন্যান্য প্রয়োজনেও জল সরবরাহ করছে এই প্রকল্প। তবে প্রগতির এই সমতা বজায় রাখতে এই বাঁধের মেরামতির কাজ, যথার্থ রক্ষণাবেক্ষণ, খালের সংস্কার বিশেষভাবে প্রয়োজন ছিল যাতে আগামী দিনগুলোতে প্রকল্পটি তার আরোপিত কাজ যথার্থভাবে সমাধা করতে পারে।

খরাপ্রবণ জেলা পুরুলিয়ার উন্নয়নে ফুটিয়ারি সেচ প্রকল্প

'এই প্রকল্প ফুটিয়ারি ঝোরার উপর বাঁধ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। এখানকার জলাধারটি ময়ূরাক্ষী জলাধারেরই ছোট সংস্করণ। রুক্ষ শুষ্ক ল্যাটেরাইটযুক্ত কঠিন মাটিকে সরস করে তাতে চাষ-আবাদ করা বড় সমস্যার কাজ। উন্নয়নের লক্ষ্যে সেই সমস্যারই সমাধান করে এখানকার চাষীদের কাছে এগিয়ে এসেছেন রাজ্যের সেচ বিভাগ।' গত ৭ মার্চ ২০০১ পুরুলিয়া জেলার হুড়া থানা এলাকায় ৭৯.৩২ হেক্টর বিশিষ্ট জলাধারের ফুটিয়ারি সেচ প্রকল্পের উদ্বোধন করতে এসে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৎকালীন মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এ কথা বলেন। তিনি জানান, এই জেলায় এ রকম ৩২টি মাঝারি ওছোট সেচ প্রকল্প আছে। এর ভেতরে ২৩টি প্রকল্পের কাজ ইতিমধ্যেই শেষ করতে পেরেছি আমরা। বাকি প্রকল্পগুলির কাজ চলছে।এ ধরনের সেচ প্রকল্পগুলি যেমন চাষের কাজে জলের জোগানদেবে তেমনই আবহাওয়ার তারতম্য ঘটিয়ে জেলাকেও নিয়ে যাবে সবুজায়নের পথে। অসমাপ্ত সেচ প্রকল্পগুলি তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য তিনি সেচ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে আবেদন রাখেন।

অনুষ্ঠানে এদিন পৌরোহিত্য করেন পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, যে সমস্ত চাষের জমি এই প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণ করা হয়েছে জমিবাবদ সেই সমস্ত চাষীরা তাদের মূল্য পেয়ে গেছেন। কিন্তু তাদের কাজকর্মের জন্য চিন্তাভাবনা চলছে। ওই পরিবারের মানুষদের সমবায়ের আওতায় নিয়ে এসে যদি এই প্রকল্পের জলাধারে মাছ চাষ বা হাঁস চাষ করা যায় তবে তা থেকে তাদের একটা স্থায়ী উপার্জনের ব্যবস্থা করা সম্ভব। অনুষ্ঠানে

ফুটিয়ারি সেচ প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তৎকালীন সেচমন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ত্রাণ বিভাগের প্রাক্তন মন্ত্রী সত্যরঞ্জন মাহাতো ও সেচ বিভাগের বর্তমান রাষ্ট্রমন্ত্রী গণেশচন্দ্র মণ্ডল। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী বিলাসিবালা সহিস এ রকম একটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা জলাধারের পাশে বনসৃজন করে, জায়গাটিকে ভ্রমণের স্থান হিসেবে গড়ে তুলে, স্থানীয় যুবসমাজকে ওই কাজের সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব রাখেন। অনুষ্ঠানে এদিন উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক অবিনাশ মাহাতো-সহ পঞ্চায়েতের বহু সদস্য এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকবৃন্দ।

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

কানা নদীর উপর পাকা সেতু

হুগলি জেলায় কানা নদীর উপর ৮২০ চেনে সেচ ও জলপথ দপ্তরের একটি পাকা সেতুর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সেচ ও জলপথ বিভাগের মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী গণেশচন্দ্র মণ্ডল। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলা সভাধিপতি মাননীয় শ্রীঅসিত পাত্র মহাশয় এবং মাননীয় সাংসদ শ্রীঅনিল বসু মহাশয়। পৌরোহিত্য করেন অগ্নি পরিষেবা বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীপ্রতিম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়।

বাণীপুর লোকউৎসব

অন্যান্য বারের মতো এবারেও বাণীপুরে জমে উঠেছিল লোকসংস্কৃতি উৎসব। বিভিন্ন বিভাগসহ সেচ ও জলপথ বিভাগের একটি প্রদর্শনী মঞ্চও এই উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ ছিল।

বাণীপুরে লোকউৎসবের তোরণ

৫৪তম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

গত ১৫ আগস্ট দেশের ৫৪তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বিধাননগরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগের জলসম্পদ ভবনে পতাকা উত্তোলন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগের সচিব পীযূষকান্তি বসু মহাশয়। এ দিনের অনুষ্ঠানে সেচ ও জলপথ দপ্তরের অন্যান্যদের মধ্যে আর যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মুখ্য বাস্তুকার/১ চন্দন রায়, মুখ্য বাস্তুকার ও কর্মচারি বিষয়ক অধিকর্তা অলকেশ দাশগুপ্ত, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগের বিশেষ সচিব অশোক ভট্টাচার্য, বৃহত্তর কলকাতা নিকাশি মণ্ডলের অধীক্ষক বাস্তুকার সাধন বিশ্বাস, মহানাগরিক নিকাশি মণ্ডলের অধীক্ষক বাস্তুকার ভবানিপ্রসাদ ঘোষ প্রমুখ। এ দিনের সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন মহানাগরিক নিকাশি ভুক্তির নির্বাহী বাস্তুকার অজয় বসাক।

জলসম্পদ ভবনের পতাকা তুলছেন সেচ সচিব পীযূষকান্তি বসু

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলায় সেচ ও জলপথ বিভাগ

সম্প্রতি রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পপীঠ, বেলঘরিয়া আয়োজিত সারা বাংলা আন্ত পলিটেকনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগ অংশগ্রহণ করেছিল। এই মেলায় সেচ সংক্রান্ত নানান তথ্য ও জলসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন প্রদর্শনীর আয়োজন করে তাঁরা জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হন।

নিউ টাউন কলকাতা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হিডকো আয়োজিত নিউ টাউন কলকাতা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের এক প্রদর্শনীতে সেচ ও জলপথ বিভাগ বিভিন্ন ডিসপ্লে প্যানেলের মাধ্যমে তার নানান উন্নয়ন বিষয়ক সংবাদ পরিবেশন করে।

উপকূল ক্ষয় রক্ষার প্রয়োজনীয়তা—পশ্চিমবঙ্গ

দিলীপকুমার চক্রবর্তী □ *নির্বাহী বাস্তুকার সেচ ও জলপথ দপ্তর*

অদূর অতীত থেকেই পৃথিবীর জনসংখ্যা এত দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে যে বিষয়টির ওপর এখন সমগ্র পৃথিবীর জাতীয়স্তরের নেতাদের বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে এবং ভবিষ্যৎ পৃথিবীর কথা ভেবে তাদের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। সংখ্যাতত্ত্ব বিশ্লেষণ করে আগামী দিনে জনসংখ্যা বৃদ্ধির যে হার অনুমান করা যায় তা' খুবই বিপজ্জনক। এই সমস্যার সঙ্গে স্বভাবতই অনেক আনুষঙ্গিক সমস্যা দেখা দেবে, যেমন—বাসস্থানের অকুলান, চাষযোগ্য জমির অপ্রতুলতা, খাদ্যাভাব, ভয়াবহ বেকার সমস্যা ইত্যাদি।

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই সমস্যা একটা ভয়াবহ আকার ধারণ করবে। কেননা বর্তমান অবস্থাতেই ভারতের জনসংখ্যা প্রায় সম্পৃক্ত অবস্থায় (Saturated limit) পৌঁছে গেছে।

যদি এখন থেকেই আমরা ভারতবর্ষের প্রতিটি নাগরিক, তথা জাতীয়স্তরে আমাদের নেতৃবৃন্দ সাবধানতার এবং সচেতনতার সঙ্গে দেশজ সম্পদকে কাজে লাগিয়ে, দৃঢ়তার সঙ্গে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ না করি, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে দেশের মানুষ ক্ষুধা, অপুষ্টি, মহামারী ইত্যাদির মারণযজ্ঞে বহ্ন্যুৎসবে প্রজ্জ্বলিত হয়ে দেশকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে। কাজেই বিভিন্ন উন্নয়নমুখী প্রকল্প প্রণয়নে যত দেরি হবে, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার ততই ক্রমাবনতি ঘটবে এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার বিস্ফোরণ দেশকে ধ্বংসের মুখে পৌঁছে দেবে।

বন্ধ্যা, বাদা জমিকে উদ্ধার করে কাজে লাগানো খুব সহজ ব্যাপার নয়। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গে বনাঞ্চলের পরিমাণ এতই কম যে বনাঞ্চলকে কমিয়ে কৃষিজ জমিতে পরিণত করলে, পশ্চিমবঙ্গ তার পরিবেশের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে বিপর্যয় ডেকে আনবে। পশ্চিমবঙ্গের জনবসতি এলাকা থেকে কৃষিজ জমি বৃদ্ধির কোনও সুযোগও আর নেই। স্বভাবতই পশ্চিমবঙ্গে আমাদের যে ভূমিসম্পদ রয়েছে তার সুরক্ষা একান্তভাবে প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, উত্তর চব্বিশ পরগনা এবং মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাঞ্চল বঙ্গোপসাগর দ্বারা পরিবৃত। পশ্চিমবঙ্গের এই তিনটি জেলার উপকূলাঞ্চল বঙ্গোপসাগরের ক্রমাগত ঢেউয়ের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে সমুদ্রে বিলীন হয়ে পশ্চিমবঙ্গের আয়তনকে ক্রমশ কমিয়ে আনছে। শুধু তাই-ই নয়, প্রায়শই উপকূলভাগের মাটির বাঁধ ভেঙে সমুদ্রের লবণাক্ত জল লোকালয় ও কৃষিজ জমিতে প্রবেশ করে জীবন, সম্পত্তি নষ্ট করছে ও কৃষিজ জমিগুলিকে ৩/৪ বৎসরের জন্য লবণাক্ত অফসলা বাদা জমিতে পরিণত করছে এবং ভূমিক্ষয় ঘটিয়ে রাজ্যের অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত তো করছেই, সেই সঙ্গে ভূমিসম্পদের আয়তনকেও কমিয়ে আনছে।

দীঘা সমুদ্রোপকূলের দৃশ্য

আজ তাই জনপ্রতিনিধি, জনগণ, দেশের প্রযুক্তিবিদ তথা ইঞ্জিনিয়ারদের এই বাস্তব পরিস্থিতির মুখে দাঁড়িয়ে এমন একটা পরিকল্পনা রচনা এবং তার যথাশীঘ্র প্রণয়ন প্রয়োজন যাতে দেশের ভূমিসম্পদকে কোনোভাবেই নষ্ট হতে দেওয়া না হয়, যাতে স্থিত ভূমিসম্পদকে বরাবরের জন্য বিপদমুক্ত করা যায়।

শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয় সমস্ত ভারতের উপকূলবর্তী রাজ্যগুলিরও এই একই সমস্যার কথা মাথায় রেখে ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় সেচ কমিশন 'উপকূল ক্ষয়রোধ পর্ষদ' গড়েছেন। ভাবনাচিন্তা ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে কোনও কোনও রাজ্যে এই পর্ষদের মাধ্যমে ও সহযোগিতায় উপকূল ক্ষয়রোধের কাজও শুরু হয়ে গেছে।

উপরোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা ও উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার সুন্দরবনাঞ্চল-সহ মেদিনীপুর জেলার বঙ্গোপসাগর পরিবেষ্টিত উপকূলভাগে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ঢেউয়ের ধাক্কায় উপকূল অঞ্চলের ক্ষয়রোধ করা একটা নিশ্চিত কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্বভাবতই পশ্চিমবঙ্গের সেচদপ্তর এ বিষয়ে খুঁটিনাটি বিশদ পর্যবেক্ষণ করে 'কেন্দ্রীয় জল আয়োগ' (Central Water Commission) ও কেন্দ্রীয় সরকারের 'উপকূল ক্ষয়রোধ পর্ষদ'-এর (Beach Erosion Board) কতকগুলি কারিগরি সুপারিশ অনুসারে প্রথম পর্যায়ের একটি পরিকল্পনা তৈরি করেছেন। সেচদপ্তরের বাস্তুকারেরা উপরোক্ত কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করে এই প্রকল্প ও তার নকশা রচনার কাজ শেষ করে ফেলেছেন।

এই প্রকল্পের নকশা পরিকল্পনা ও রচনা করতে সেচদপ্তরের বাস্তুকারদের উপকূল

অঞ্চলে বাঁধ রক্ষার বিভিন্ন সমস্যার পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এবং কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির সুপারিশ অনুযায়ী প্রযুক্তিকে কাজে লাগাতে হয়েছে। যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে, শ্রমসাধ্য এই প্রকল্প রচনার প্রথম পর্যায়ের কাজ সেচদপ্তরের বাস্তুকারেরা শেষ করে ফেলেছেন এবং কেন্দ্রীয় সেচ-আয়োগ নির্দেশিত প্রথায় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের উপকূল ক্ষয়রোধ-এর প্রথম পর্যায়ের ২৫৭.৬৫ কোটি টাকার এই পরিকল্পটি কেন্দ্রীয় জল কমিশন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কেন্দ্রীয় পর্যদগুলিকে পাঠানো হয়ে গেছে প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য।

পশ্চিমবঙ্গের উপকূলাঞ্চলের দৈর্ঘ্য প্রায় ৬৫ কিলোমিটার। এর মধ্যে সুন্দরবনাঞ্চলে (দক্ষিণ ২৪-পরগনা ও উত্তর ২৪-পরগনা জেলা) উপকূলের দৈর্ঘ্য ৪২ কিলোমিটার এবং মেদিনীপুর জেলায় ওই দৈর্ঘ্য ২৩ কিলোমিটার। শুধু পশ্চিমবঙ্গই নয় ভারতবর্ষের উপকূলাঞ্চল পশ্চিমবঙ্গ ওড়িশা থেকে শুরু করে কুমারিকা অন্তরীপ হয়ে গুজরাট রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত। বিরাট এই ভারতবর্ষের উপকূলের দৈর্ঘ্যও বিশাল এবং বিভিন্ন রাজ্যের উপকূলাঞ্চলের মৃত্তিকাও বিভিন্ন রকমের। তাই সমগ্র ভারতবর্ষের কথা চিন্তা করে উপকূলাঞ্চলের সন্নিকটবর্তী প্রাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদকে যথাসম্ভব কাজে লাগিয়ে 'উপকূল ক্ষয়রোধ পর্যদ' বিভিন্ন রাজ্যে বা একটি রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে পাকাপাকিভাবে উপকূল ক্ষয়রোধের জন্য যে সব বাঁধের নকশা বানাবার সুপারিশ করেছেন—সেই সুপারিশ এবং আঞ্চলিক বিভিন্ন প্রাকৃতিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে জনসংখ্যা জর্জরিত ভারতবর্ষের আয়তন যাতে উপকূল ক্ষয় হয়ে কমে না যায় তার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পাকাপাকি উপকূল ক্ষয়রোধ পরিকল্পনাগুলির কাজকে অগ্রাধিকার দিয়ে জরুরি ভিত্তিতে সম্পন্ন করা আশু প্রয়োজন। অন্যথায় আগামী দিনে ভারতবর্ষ একটা বিরাট আর্থ-সামাজিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়বে। যার ফল কী হতে পারে সে কথা বিস্তৃতভাবে আগেই বলা হয়েছে।

আশা করা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সেচ আয়োগ বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে শীঘ্রই প্রকল্পটির অনুমোদন দেবেন এবং যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে এর কাজ শুরু হয়ে যাবে।

উপরোক্ত বিষয়ের কারিগরি দিক নকশা (Design) এবং তথ্য ও পরিসংখ্যান ইত্যাদি কেন্দ্রীয় সেচ আয়োগ কর্তৃক প্রকল্পটি অনুমোদন লাভ করলে বিস্তারিত প্রকাশের অঙ্গীকার রইল।

বনগাঁয় সেচ ও জলপথ দপ্তরের একটি উপ-ভুক্তির উদ্বোধন

বনগাঁ সেচ উপ-ভুক্তির অফিসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সেচ ও রাষ্ট্রমন্ত্রী গণেশচন্দ্র মণ্ডল

গত ২৬ জুন মঙ্গলবার, উত্তর ২৪-পরগনা জেলার বনগাঁ শহরের বাটা মোড়ে, মধুসূদন মার্কেটের তৃতীয় তলে সেচ ও জলপথ দপ্তরের বিদ্যাধরী নিকাশি ভুক্তির অন্তর্গত বিদ্যাধরী নিকাশি উপ-ভুক্তির নতুন অফিসের উদ্বোধন করেন সেচ ও জলপথ বিভাগের মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী গণেশচন্দ্র মণ্ডল। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন যে আজকের এই অনুষ্ঠান খুবই ছোট, কিন্তু এর গুরুত্ব অসীম। এখানে সেচ দপ্তরের কোনো অফিস ছিল না, স্বাধীনতার পরে এই প্রথম এখানে একটি অফিস হল। মহকুমা স্তরে এই অফিসটি এখানে খোলা হল জনসংযোগের কর্মসূচি হিসেবে। কেননা বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও বিভিন্ন সংগঠন ইছামতী নিয়ে নানারকম মতামত দেন। আমরা সেটা গুরুত্ব দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি।

এই এলাকায় ডি ভি সি বা ময়ূরাক্ষীর জল আসে না বা আসার সম্ভাবনা নেই। এখানে যে সম্ভাবনা তা হল এখানকার অববাহিকায় বেশি বৃষ্টি হলে জল জমে যায়। আমরা এ জন্য যে পদক্ষেপ নিয়েছি তা ইছামতীর সংস্কার। অর্থাৎ এই নদীর যেখানে যেখানে পাটা আছে, যেখানে যেখানে ভেড়ি আছে, ভেচাল বা কচুরিপানা আছে সেগুলি সরিয়ে ফেলা। ইতিমধ্যেই আমরা অনেক ভেড়ি ভেঙেছি, ড্রেজিং করেছি, ফলে এখন নদীতে একটা অন্তঃপ্রবাহ লক্ষ করা যাচ্ছে।

অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে ছিলেন উত্তর ২৪-পরগনা জেলার জেলা সভাধিপতি শ্রীমতী অপর্ণা গুপ্ত এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক পঙ্কজ ঘোষ। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন যে এই শহর বহু প্রত্যাশার একটা বাস্তব রূপ আজ দেখতে চলেছে। ইছামতী-যমুনার সমস্যার কথা আমি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় বলি এবং বলতে বলতে সরকারের দৃষ্টিতে আনতে তা সমর্থ হয়েছি। আজ এখানে একটা অফিস হয়েছে। আগে ইছামতী-যমুনায় কী হচ্ছে তা জানাতে বারাসতে ছুটতে হত। কিন্তু এখন তা আমাদের হাতের মুঠোয়। কেননা বনগাঁ শহরের মানুষের দাবি খুবই সামান্য—যাতে বন্যায় আর তাদের ডুবতে না হয়, যাতে অমন কোটি কোটি টাকার ফসলহানির খবর আর না পেতে হয়।

[এরপর ১৬ পৃষ্ঠায়]

নিকাশি খালগুলির সাধারণ সমস্যা

দিলীপ কর্মকার / *অবর-সহ বাস্তুকার, সেচ ও জলপথ দপ্তর*

বর্ষা মরসুমে অধিক বৃষ্টিপাতের দরুন বিভিন্ন এলাকার বেশ কিছু অংশ জলমগ্ন হওয়ার একটা আশঙ্কা থেকেই যায়। আবার এই জল সময়মত নিকাশি খালগুলি থেকে নিষ্কাশিত না হওয়ার ফলেই এক ভয়াবহ সমস্যা তৈরি হয়।

পরিকল্পনা অনুযায়ী সমস্ত খালগুলি যে সময়ে কাটা হয়েছিল তখনকার ভৌগোলিক পরিকাঠামোর সঙ্গে আজকের দিনের পরিকাঠামোর বহু অংশেই মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। ফলে নিকাশি খালগুলির চরিত্রও বদলেছে।

ক. স্বাধীনতার পর থেকে ক্রমাগত জনসংখ্যার চাপ বেড়েছে সব স্থানে। উদ্ভূত হয়েছে বাসস্থানের সমস্যা। এই সমস্যা মেটাতে গিয়ে চাষের জমি, জলা জমি, পুকুর ভরাট করে, এলাকায় এলাকায় শহর যেমন বেড়েছে দ্রুত, তেমনই এসব এলাকায় অবস্থিত নিকাশি খালগুলির ওপরও চাপ পড়েছে। ওই সব দ্রুত বেড়ে ওঠা বাসস্থানের ব্যবহৃত জল ও কিছু আবর্জনা সরাসরি প্রতিনিয়ত আসছে নিকাশি খালগুলিতে এবং বিভিন্ন অংশের এই ব্যবহৃত জল ও আবর্জনার বিপুল পরিমাণ নিকাশি খালগুলিকে যে ক্রমশ সঙ্কুচিত করে তুলছে তাতে আর কোনও সন্দেহই নেই।

খ. নিকাশি খালগুলির একটি অন্যতম প্রতিবন্ধকতা বর্জ্য পদার্থ। নিত্য ব্যবহৃত বর্জ্য পদার্থ বিভিন্ন ধারাতে ও পদ্ধতিতে নির্গত হয়ে এ সমস্ত নিকাশি খালে এসে পড়ে। ফলে খালগুলির তল [বেড] উঁচু হয়ে যায়। গৃহস্থালীর বর্জ্য পদার্থ, মলমূত্র হাটে-বাজারের আবর্জনা / বর্জ্য পদার্থ থেকে শুরু করে কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ অনবরত ফেলা হচ্ছে খালগুলিতে। সরাসরি আসছে খাটালের বর্জ্য পদার্থ। এর ফলে পলি (Silt) সঞ্চিত হচ্ছে খালগুলির তলে। বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে নিকাশি ব্যবস্থার। কমে যাচ্ছে জলধারণ ক্ষমতা। খালের অনেক অংশ আছে যা দেখে বোঝা যায় না যে, ওটা নিকাশি খাল, না বর্জ্য পদার্থের আস্তাকুঁড়।

গ. বিগত দিনে নিকাশি খালগুলির যে সেকশন অর্থাৎ প্রস্থ ও উচ্চতা ছিল, খালে পলি (Silt) বৃদ্ধি পাওয়াতে খালগুলির গভীরতা কমছে। খালের দুই পাড় বেআইনি দখলদারির ফলে অস্থায়ী বাসস্থান (ঝুপড়ি) তৈরি হয়েছে এবং অনেক অংশে খালগুলির প্রস্থ কমেছে। আবর্জনা দিয়ে খালের পাড় বাড়িয়ে তা ব্যবহার করছে এই বেআইনি দখলদারেরা। সে কারণে কমে গেছে খালগুলির জল ধারণ ও বহন ক্ষমতা। অন্যদিকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাখা খালের দুই পাড়ের জমি ব্যবহৃত হচ্ছে অবাধে, ফলস্বরূপ বিঘ্নিত হচ্ছে খালগুলির রক্ষণাবেক্ষণের কাজ, যা নিকাশি ব্যবস্থা সঠিক ও সচল রাখার জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন।

উত্তর ২৪ পরগনার একটি নিকাশি খাল

ঘ. কয়েকটি খালে রাস্তা ও রেলওয়ে ক্রসিংগুলির পরিসর অপ্রশস্ত হওয়ায় নিকাশি ব্যবস্থার সমস্যা দেখা দেয়। অপরিসর ওই পথে জল প্রবাহের গতি বাধা পেয়ে থমকে যায়, এবং নিষ্পত্তি না হওয়ায় এলাকাকে জলমগ্ন করে।

ঙ. বেশির ভাগ খালে ভাসমান কচুরিপানা একটি বড় সমস্যা। খালে জলের প্রবাহ সঠিক থাকলে কচুরিপানা খালে অবস্থান করতে পারে না। কিন্তু বিভিন্ন কারণে জলের প্রবাহ কমে যাওয়ায় খালে কচুরিপানা জমে বড় হয়, পচে ও নিকাশি খালে পলি (Silt) হয়ে খালের বেডে জমে এবং খালের নাব্যতা কমায়। আর যে সমস্ত নিকাশি খালের প্রবাহ ভালো, নদীর নিকটবর্তী খালের অংশের জল অনেক সময় চাষের কাজেও ব্যবহৃত হয়। খালের এই জলপ্রবাহ স্থানীয় মানুষকে মাছ-চাষে প্রলুব্ধ করে এবং খালে ঘন ঘন মাছ ধরার জাল পাতার ফলে প্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয় ও অন্যদিকে জলের ভাসমান পদার্থ এবং কচুরিপানা বাধা পেয়ে সরাসরি নদীতে যায় না। প্রায়শই দেখা যায় খালের বেশিরভাগ অংশেই কচুরিপানা ছড়িয়ে পড়ে, বড় হয়, ও পচনের পর খালের পলি (Silt) বৃদ্ধি ঘটায়।

চ. বর্ষাকালে স্বাভাবিক থেকে বেশি বৃষ্টিপাতের দরুন নিকাশি খালের দুই পাড়ের নিচু অঞ্চল জলমগ্ন হবার আশঙ্কা থাকে। দেখা যায় আগে পরিকল্পিত খালগুলি অতি বৃষ্টির জল ধারণ না করতে পারলেও, আশপাশের পুকুর, জলাশয়, বিল ইত্যাদি, এই জল ধারণ করে নিচু অঞ্চলের জলমগ্ন হওয়ার সমস্যার সমাধান করত। ইদানিং ওই সব পুকুর, বিল ইত্যাদির সংখ্যা

ক্রমশ কমে আসার ফলে, ধারণ ক্ষমতা অস্বাভাবিক বা অতি বৃষ্টির জল ধারণ করতে পারছে না। অন্যদিকে এই বৃষ্টির জল একই সময়ে নিকাশি খাল দিয়ে প্রবাহের ফলে এবং ওই অনুপাতে ধারণ ও বহন ক্ষমতা খালগুলির না থাকার জন্যেও সমস্যার সৃষ্টি হয়।

ছ. প্রত্যেকটি নিকাশি খালের নিজস্ব একটি জলসত্ত্ব আছে, যা ওই এলাকার বৃষ্টির জল ও বর্জ্য জল ধারণ ও বহন করে। এই জলসত্ত্ব-এর মধ্যে অসংখ্য নালা / ড্রেন কাঁচা বা পাকা আছে, যা ওই এলাকার বৃষ্টির জল ও বর্জ্য জল বহন করে নিয়ে আসে নিকাশি খালে। খালগুলি খননের সময় যে পরিমান ধারণক্ষমতার কথা ভেবে নকশা তৈরি করা হয়েছিল আজ জনসংখ্যার বিস্ফোরনে ও দ্রুত নগরায়নের ফলস্বরূপ খালগুলিতে যে জল এসে পড়ছে তা পরিকল্পনাকালীন ধার্য্য পরিমাপের কয়েকগুণ তাই স্বাভাবিকভাবেই খাল তা বহনে অক্ষম, উপরন্তু আর্থসামাজিক সমস্যার দরুণ খালপাড়ের উপরে লোকের বসবাস খালের আয়তন আরও গ্রাস করেছে। স্বাভাবিক খালের জলধারণ ক্ষমতা অপ্রতুল হয়ে পড়েছে।

জ. সাধারণত বেশিরভাগ খালগুলির নিম্নপ্রবাহ নদীতে। ওই নদীগুলির নাব্যতা কমে যাবার ফলে এবং নিকাশি খাল ও নদীর সংযোগস্থলে পলি জমায় স্বাভাবিক নিকাশি ব্যবস্থা বাধা পাচ্ছে। এ ছাড়া নদীগুলি জোয়ার-ভাঁটার নদী। আগে ভাঁটায় যত সময় ধরে নিকাশি খালের জল নিষ্কাশিত হত, সংযোগস্থলের নাব্যতা কমে যাওয়ায় ইদানিং তত সময় ধরে আর জল নিষ্কাশিত হয় না, প্রায় ১৫ থেকে ৩০ শতাংশ কম সময়ে খালের জল নিষ্কাশিত হয়। ফলে বহুল অংশে সমস্যা দেখা যাচ্ছে।

ঝ. বিজ্ঞান প্রযুক্তির অগ্রগতিতে ব্যবহার হচ্ছে প্লাস্টিক/পলিথিন। ব্যবহৃত হচ্ছে বিভিন্ন শিল্পে, ব্যবসায়, এমনকী গৃহস্থালীতে, দৈনন্দিন হাটে-বাজারে মানুষ পুরোন প্রথায় ব্যবহৃত কাপড় ও চটের থলের পরিবর্তে আকছাড় ব্যবহার করছে পলিথিনের ব্যাগ। এই সমস্ত ব্যবহৃত পলিথিন ব্যাগ যেহেতু পচনযোগ্য নয় তাই এর পরিবেশগত সমস্যা একটা আছেই, আবার ওই সমস্ত ব্যবহৃত পলিথিন নিকাশি খালে বর্জ্য পদার্থের সঙ্গে আসার ফলে দুইভাবে সমস্যা হয়। ভাসমান প্লাস্টিক/পলিথিন বস্তু খালের স্বাভাবিক প্রবাহে বাধার সৃষ্টি করে। আবার নিমজ্জমান ওই সব প্লাস্টিক বস্তু যেমন খালের পলি (Silt) বৃদ্ধি করে, অন্যদিকে খালের পলি পরিষ্কার করার সময় বেশ সমস্যার সৃষ্টি করে।

সমস্যা অনুসন্ধানে এটা বলা যায় যে, এর সমাধানের লক্ষ্যে যেমন আছে প্রযুক্তিগত দিক আবার সঙ্গে আছে জনসাধারণের সহযোগিতা ও সচেতনতার দিক। এই দুই একে অপরের পরিপূরক। প্রয়োজন, নির্দিষ্ট খালের সমস্যা সমাধানে যুগোপযোগী সঠিক আধুনিক পরিকল্পনা এবং ধারাবাহিক রক্ষণাবেক্ষণ, অন্যদিকে বিশেষভাবে প্রয়োজন জনসচেতনতা। যে ভাবনা আগে সমাজকে ভাবতে হত না, সমস্যার মোকাবিলায় আজ সবার আগে দরকার জন সচেতনতা এবং তা গড়তে হবে সরকারি, বেসরকারি ও আঞ্চলিক সংগঠনগুলির সক্রিয় উদ্যোগে।

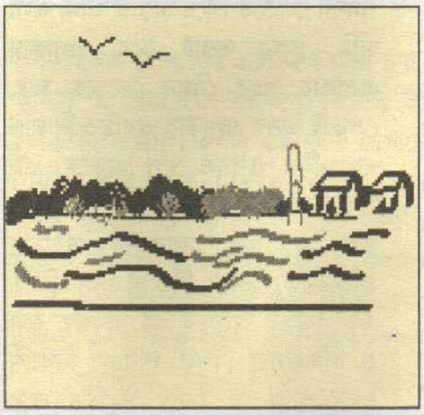

বনগাঁয় সেচ ও জলপথ দপ্তরের উপ-ভুক্তির উদ্বোধন

[১৪ পৃষ্ঠার পর]

জেলা সভাধিপতি শ্রীমতী অপর্ণা গুপ্ত জানান, এই অনুষ্ঠান কেবল একটি মামুলি অনুষ্ঠানই নয়, এটি একটি ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। আমাদের এই জেলা নদীবেষ্টিত। এখানকার নদীগুলোর নাব্যতা কমছে। এ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ পদযাত্রা করেছেন। আলোচনা করেছেন। প্রধানমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দিয়েছেন। কেননা নদীর এই সমস্যা মেটানো রাজ্য সরকারের একার পারার কথা নয়। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকেও এগিয়ে আসতে হবে। কথায় আছে 'নদীর পাড়ে বাস দুঃখ বারোমাস।' আসুন আমরা সবাই মিলে সেই দুঃখ দূর করার চেষ্টা করি।

এ দিনের অনুষ্ঠানে বনগাঁ মহকুমা শাসক শ্রীমিলন প্রামাণিক ছাড়াও বনগাঁ পুরসভার প্রধান তাপস মুখোপাধ্যায়, কাউন্সিলার মমতা দাস, কাউন্সিলার সাধন দাস ও কাউন্সিলার দীপক রায় উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন সেচ ও জলপথ দপ্তরের বৃহত্তর নিকাশি মণ্ডলের অধীক্ষক বাস্তুকার সাধন বিশ্বাস এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানান বিদ্যাধরী নিকাশি ভুক্তির নির্বাহী বাস্তুকার প্রদীপ্ত ব্যানার্জি। অনুষ্ঠানে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিসহ সেচ ও জলপথ দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার অলকেশ দাশগুপ্তও উপস্থিত ছিলেন।

বন্যা ২০০০ : ক্ষয়ক্ষতি ও পুনর্গঠন

সেপ্টেম্বর ২০০০ এর নজিরবিহীন বৃষ্টিপাত এবং ফলস্বরূপ ভয়ঙ্কর বন্যা পশ্চিমবঙ্গের ৯টি জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত করে। বিভিন্ন ধরনের ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি এই দপ্তরের বহু নির্মিত কাজের ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং নদীবাঁধগুলি অসংখ্য স্থানে ভেঙে যায়। পরে পরেই ব্যাপক মেরামতির কাজ হাতে নেওয়া হয়, যার বেশির ভাগই সমাপ্ত হয়েছে ও বাকিটা সমাপ্তির পথে।

◆ ভাগরথী নদীর বাঁ-হাতি বাঁধের (জগৎখালি বাঁধ) ভাঙন, ইরার ডাঙা। জেলা : নদিয়া

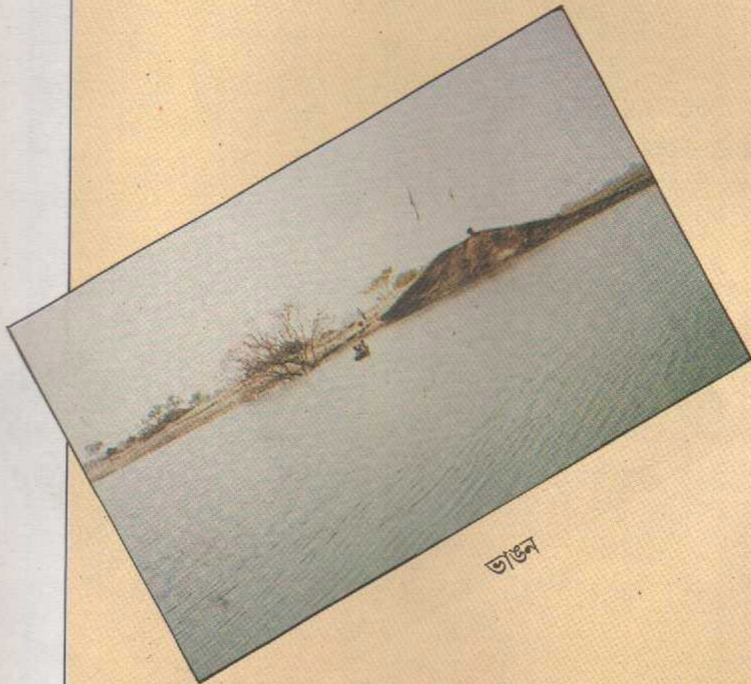

ভাঙন

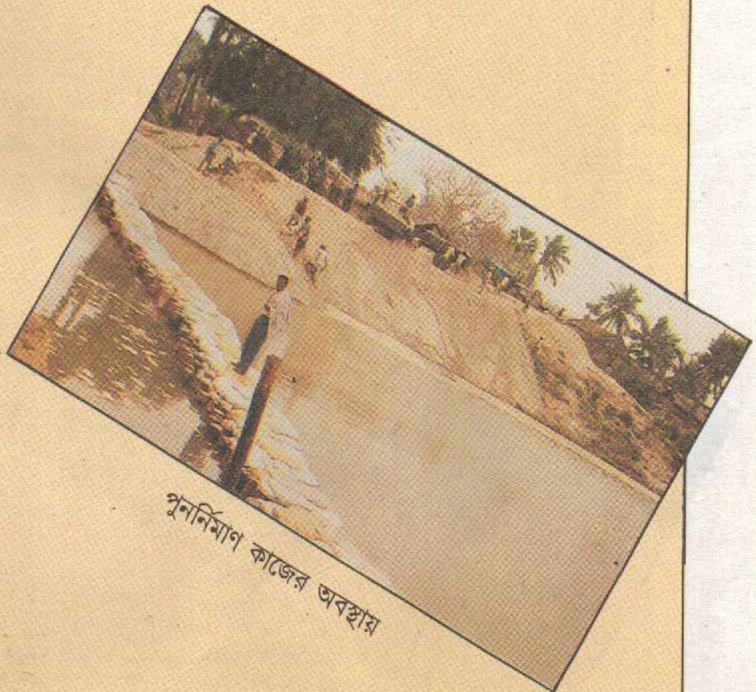

পুনর্নির্মাণ কাজের অবস্থায়

◆ ধান্যগ্রামে ময়ূরাক্ষী নদীর ডানহাতি বাঁধের ভাঙন, জেলা : বীরভূম

ভাঙন

পুনর্নির্মাণ কাজের অবস্থায়

◆ ভানরিরবন (রায়পুর) ময়ূরাক্ষী নদীর ডানহাতি বাঁধের ভাঙন, জেলা : বীরভূম

ভাঙন

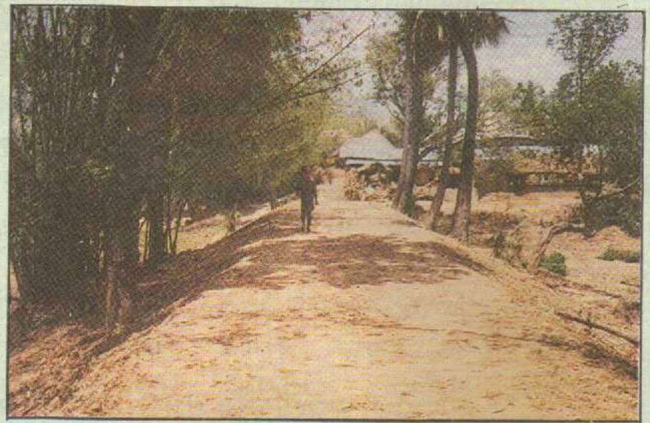

পুনর্নির্মাণ কাজের অবস্থায়

◆ দেওচা (দ্বারকা) ব্যারেজের ডান তীরের অ্যাফ্লাক্স বাঁধের ভাঙন, জেলা : বীরভূম

ভাঙন

পুনর্নির্মাণ কাজের অবস্থায়

◆ সরলপুর (মরগ্রাম) দ্বারকা নদের ডান তীরের ভাঙন, জেলা : বীরভূম

ভাঙন

পুনর্নির্মাণ কাজের অবস্থায়

◆ কুজোপাড়া (মরগ্রাম) দ্বারকা নদের ডান তীরের ভাঙন, জেলা : বীরভূম

ভাঙন

পুনর্নির্মাণ কাজের অবস্থায়

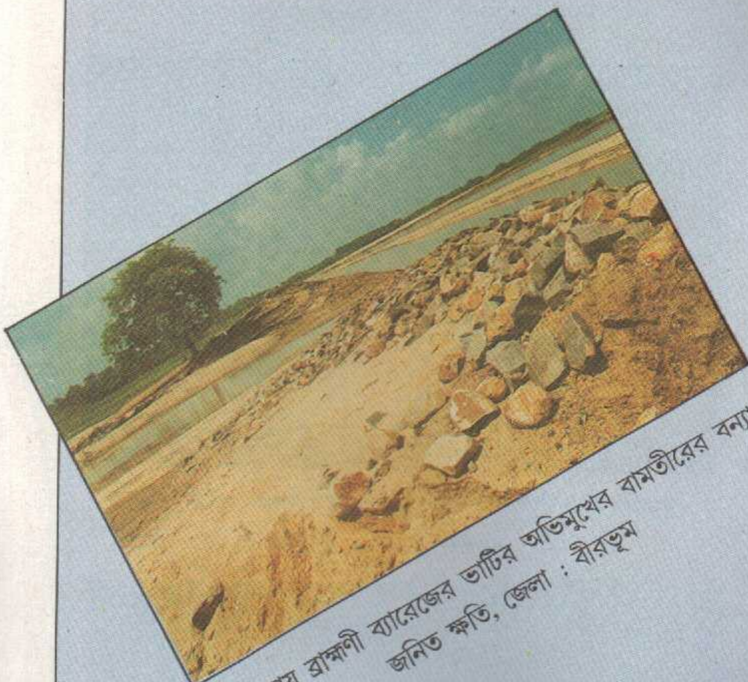

বৈদরায় ব্রাহ্মণী ব্যারেজের ভাটির অভিমুখের বামতীরের বন্যা জনিত ক্ষতি, জেলা : বীরভূম

কুন্দপাড়ায় ব্রাহ্মণী নদীর বাম তীরের ভাঙন, জেলা : বীরভূম

ভাঙন

হরিদাসপুরের (নলহাটি) ব্রাহ্মণী উত্তর খালের ভাঙন, জেলা : বীরভূম

পুনর্নির্মাণ কাজের অবস্থায়

মালিয়ারায় অজয় নদের ডানহাতি বাঁধের ভাঙন, জেলা : বীরভূম

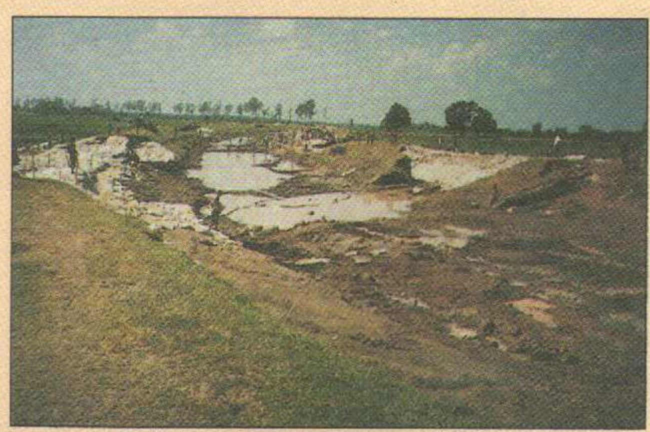

ব্রাহ্মণী উত্তর খালে মেরামতির কাজ
জেলা : বীরভূম

দ্বারকা নদের সরলপুরের (মরগ্রাম) ডান তীরের বাঁধের
মেরামতির কাজ, জেলা : বীরভূম

ভানরিরবনে ময়ূরাক্ষী নদীর মেরামতির কাজ (চেইন ২০৩০-
২১৬০) জেলা : বীরভূম

ভানরিরবনে ময়ূরাক্ষী নদীর মেরামতির কাজ (চেইন ১৭০০-
২০৩০) জেলা : বীরভূম

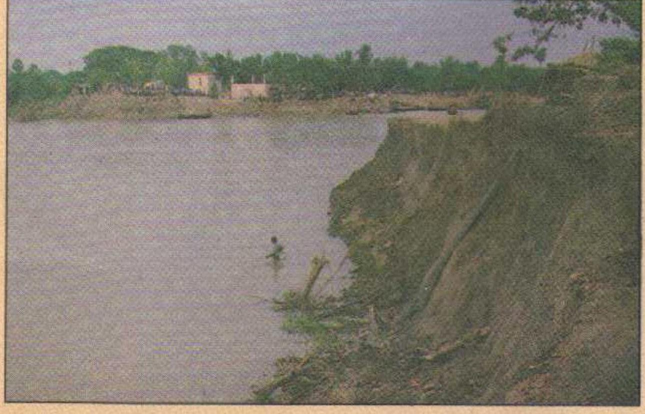

ভাঙন

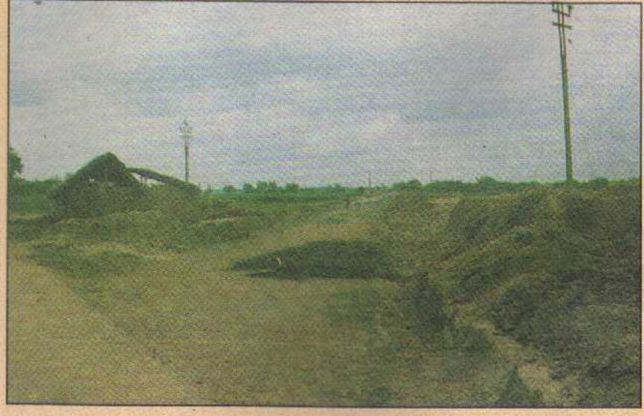

কালুখালি ভাঙনের কাছে রাস্তা তথা 'বন্যা নিরোধক
বাঁধের (রিটায়ার্ড বাঁধ) পুনর্নির্মাণের কাজ, জেলা : মুর্শিদাবাদ

ভাঙন

মঝ্যামপুরে ভাগীরথীর বাঁহাতি বাঁধের পুনর্নির্মাণের কাজ
জেলা : মুর্শিদাবাদ

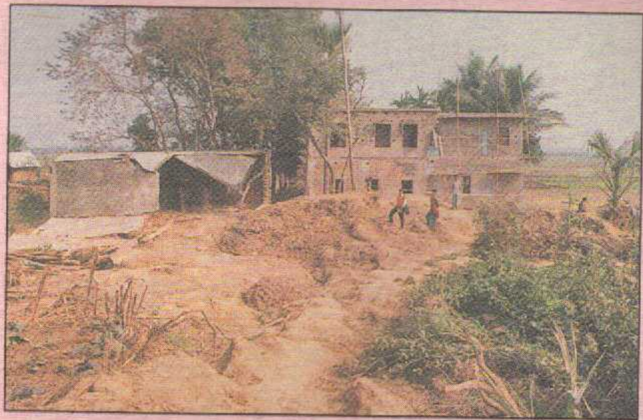

ভাঙন

ঝুরানকান্দির তিতিডাঙ্গায় বাঁকিপুরের কাছে ব্রাহ্মণী নদীর
বাম তীরের বাঁধের পুনর্নির্মাণের কাজ, জেলা : মুর্শিদাবাদ

ভাঙন

পানুটির মণ্ডলপুরে ময়ূরাক্ষী নদীর বাম তীরের বাঁধের
পুনর্নির্মাণের কাজ, জেলা : মুর্শিদাবাদ

বি. দ্র. : সেপ্টেম্বর ২০০০-এর বিধ্বংসী বন্যায় ময়ূরাক্ষী প্রকল্পের সেচ খালব্যবস্থার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং ফলস্বরূপ সেচ আওতাভুক্ত এলাকার সেচ ব্যবস্থা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে সমস্ত ক্ষতিগ্রস্থ স্থানে স্বল্পমেয়াদি মেরামতির কাজ শেষ করা হয় এবং সাফল্যের সঙ্গে চাষের জমিতে সেচের জল পৌঁছে দিয়ে শস্য বাঁচানো সম্ভব হয়।

উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে সেচ ও জলপথ বিভাগ—একটি প্রতিবেদন

প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ আমাদের এই পৃথিবী। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানবজাতি এই প্রাকৃতিক সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি তার সদ্ব্যবহার করে তাকে মানবকল্যাণে লাগানোর প্রয়াস করে চলেছে। আমাদের এই রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলও প্রাকৃতিক সম্পদে সম্পদশালী। ঘন বনাঞ্চল, খরস্রোতা পাহাড়ী নদী ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ এই অঞ্চল এবং অঞ্চলের নদীবাহিত জলসম্পদের উপযুক্ত ব্যবহারের জন্যই উত্তরবঙ্গের তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প।

সেচ ব্যবস্থার দ্বারা খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, গৃহস্থালি ও শিল্প বিকাশের প্রয়োজনে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, দীর্ঘ নৌপথ সৃষ্টি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির মাধ্যমে উন্নয়নের লক্ষ্যে 'তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প' রূপায়ণ করে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগ। এই বিভাগ আরও যা করে চলেছে তা হচ্ছে গ্রাম ও শহরে বন্যার প্রচণ্ডতা হ্রাস, ভূমিক্ষয় হ্রাস, খরস্রোতা নদীর গতিপথ বজায় রাখার প্রচেষ্টা ও অন্যান্য ছোট ছোট প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষি জমিতে জলসেচের কাজ ইত্যাদি।

তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প

উত্তরবঙ্গের প্রধান নদীগুলি ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গা অববাহিকার অন্তর্গত। ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় রয়েছে তিস্তা, তোরসা, জলঢাকা, কালজানি, রায়ডাক ও সংকোশ। আর গঙ্গা অববাহিকায় আছে মহানন্দা, নাগর, ট্যাঙন, পুনর্ভবা, কালিন্দী ইত্যাদি।

- **তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প থেকে প্রতি বছর শুধু বোরোতেই ৯০ হাজার হেক্টর (২ লক্ষ ২২ হাজার একর) জমিতে বোরো চাষে শুখা মরশুমে :**
- **প্রায় সাড়ে ৫ লক্ষ টন অতিরিক্ত ধান উৎপাদন করবে বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী যার মূল্য অন্তত ৩২০ কোটি টাকা।**
- **চাষীদের কর্মহীন সময়ে অন্তত ১ কোটি ১০ লক্ষ শ্রমদিবস সৃষ্টি করবে।**
- **শুখা মরশুমে সমপরিমাণ ভূ-স্তরের জল উত্তোলন ব্যয়ের তুলনায় এই প্রকল্প ২৭ কোটি টাকা সাশ্রয় করবে।**

তিস্তা হিমালয়ের কোল থেকে বেরিয়ে সিকিম ও দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সেবকের কাছে এসে সমতলে পড়েছে। পাহাড়ে ১৩৮ কিমি আর সমতলে ১৭১ কিমি পথ অতিক্রম করে বাংলাদেশের রংপুর জেলায় ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিশেছে। তাই তিস্তা আন্তর্দেশীয়। বরফগলা জলে তিস্তা সমৃদ্ধ। আবার বর্ষায় তার উত্তাল জলরাশি। সারাবছরের এই জলরাশির সঙ্গে ব্যারেজের মাধ্যমে মহানন্দা ও অন্যান্য কয়েকটি নদীর জলসম্পদকে কাজে লাগিয়ে মূলত তিস্তা বহুমুখী প্রকল্প। এ ছাড়া আছে উপর-অববাহিকায় জলাধার নির্মাণ ও খালের মাধ্যমে ব্রহ্মপুত্র-গঙ্গার সংযোগ স্থাপন।

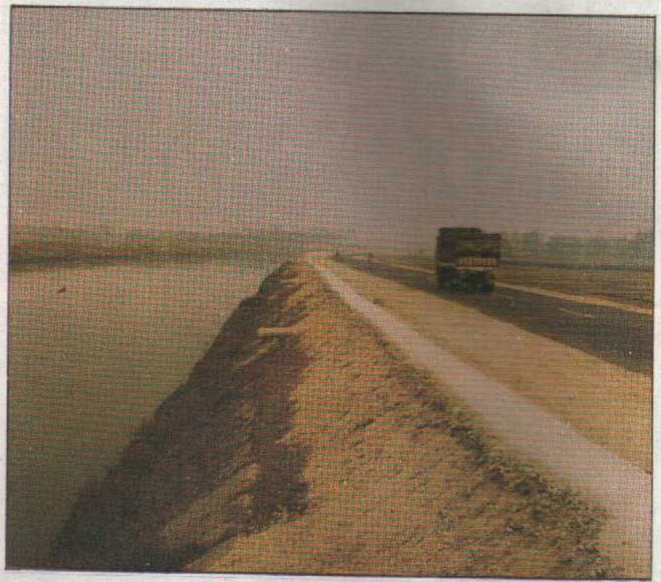

খালপাড়ের রাস্তার মাধ্যমে কলকাতার সঙ্গে দূরত্ব আরও কমেছে

সম্পূর্ণ প্রকল্পটি রূপায়ণের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদহ এই ৬টি জেলায় ৯.২২ লক্ষ হেক্টর (২৩ লক্ষ একর) জমিতে খরিফ চাষে এবং ৯০ হাজার হেক্টর (২ লক্ষ ২২ হাজার একর) জমিতে বোরো চাষে সেচের জল দেওয়া যাবে। যা প্রায় পশ্চিমবঙ্গের সম্পূর্ণ হওয়া তিনটি বৃহৎ প্রকল্প, দামোদর উপত্যকা ব্যারেজ ও ইরিগেশান, ময়ূরাক্ষী ও কংসাবতীর মোট সেচসেবিত এলাকার সমান। তা ছাড়া এই প্রকল্পে রয়েছে ৬৫০ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও ব্রহ্মপুত্র-গঙ্গা সংযোগকারী নৌপথ সৃষ্টির পরিকল্পনা।

প্রকল্পের বিশালতা বিবেচনা করে সম্পূর্ণ প্রকল্পটির কাজ ৩টি পর্ব এবং পর্বকে পর্যায় ও উপ-পর্যায়ে ভাগ করে রূপায়ণের কাজ এগিয়ে চলেছে। বর্তমানে প্রথম উপ-পর্যায়ের অধিকাংশ কাজ শেষ হয়েছে এবং ইতিমধ্যে (মার্চ ২০০০), খরিফে ৯৯,১১০ হেক্টর (২ লক্ষ ৪৫ হাজার একর) জমিতে সম্ভাব্য জলসেচের ব্যবস্থা করতে পেরেছে ও ৬০,২০০ হেক্টর (১ লক্ষ ৪৯ হাজার একর) জমিতে সেচের জল পৌঁছে দিতে পেরেছে। ২০০০-২০০১ সালের বোরো

- **তিস্তা ব্যারেজ ৯ লক্ষ ২২ হাজার হেক্টর (২৩ লক্ষ একর) জমিতে সেচের জলের মাধ্যমে খরিফ ফসল বৃদ্ধি নিশ্চিত করবে।**
- **৯০ হাজার হেক্টর (২ লক্ষ ২২ হাজার একর) জমিতে বোরো চাষ বাস্তবায়িত হবে।**
- **খালপাড়ের রাস্তার মাধ্যমে কলকাতা থেকে উত্তরবঙ্গকে আরও ৭০ কিমি কাছে আনবে।**

চাষে তিস্তা মহানন্দা সংযোগকারী খাল, করতোয়া তালমা ব্যারেজের বামও ডান পাড়ের খাল, মহানন্দা প্রধান খাল ও ডাউকনগর প্রধান খালসমূহের ডিস্ট্রিবিউটরি ও মাইনরের মাধ্যমে ২৩,১১৯ হেক্টর (৫৭ হাজার একর) জমিতে জল দেওয়া সম্ভব হয়েছে (সারণি...)। প্রতি বছরই এই এলাকা দ্রুত বাড়বে। তা ছাড়া বর্তমানে প্রায় ২২.৫ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদন (মার্চ ২০০০) করে চলেছে। শীঘ্রই এর পরিমাণ বাড়বে।

মহানন্দা ব্যারেজ

উত্তরবঙ্গ বন্যা নিয়ন্ত্রণ আয়োগ

উত্তরবঙ্গের নদীগুলি প্রধানত বরফগলা জল ও অত্যধিক বৃষ্টির জলে সমৃদ্ধ। ফলে সমতল এলাকায় নদীসমূহের অববাহিকা অঞ্চলে বর্ষায় বন্যার সমস্যা একটি পরিচিত ঘটনা। প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে বন্যা নিয়ন্ত্রণ/হ্রাসের উপর বিশেষ নজর দেওয়া হত না। জাতীয় স্তরে এই কার্যক্রম ১৯৫৪ সাল থেকেই শুরু হয়। ১৯৫৪ ও ১৯৬৮ সালের ধ্বংসাত্মক বন্যার পরেই মূলত এই বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব পায়। এবং সভাপতি ও পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট উত্তরবঙ্গ বন্যা নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ গঠন করা হয়। রাজ্য সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগের অধীনে একজন সভাপতি (মুখ্য বাস্তুকারের সমতুল্য) এবং দুজন সদস্য (অধীক্ষক বাস্তুকার পদের সমতুল্য) নিয়ে উত্তরবঙ্গ বন্যা নিয়ন্ত্রণ আয়োগ গঠিত হয়। বর্তমানে এর অধিক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত আছে দার্জিলিং (কিছু অংশ), জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলাগুলি (১৯৮৯ সালে দার্জিলিং জেলার পাহাড়ী অঞ্চল দার্জিলিং পার্বত্য পরিষদে হস্তান্তরিত হয়)।

- **শুধুমাত্র ক্যানেল ফল থেকে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিবছর ৬৭.৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে গৃহস্থালি ও কারখানার প্রয়োজন মেটাবে, যার প্রত্যক্ষ মূল্য ৫০ কোটি টাকা এবং পরোক্ষ মূল্য এর অনেক গুণ।**

উত্তরবঙ্গের নদনদীর অধিকাংশেরই উৎস সিকিম, ভুটান, তিব্বত ও দার্জিলিং পাহাড়ী অঞ্চল থেকে, যে অঞ্চলের বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২০০০ মিমি থেকে ৬০০০ মিমি। এই প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টিপাতের দরুন পাহাড়ী অঞ্চলে ধস নামা এবং সমতলে ভয়াবহ বন্যা প্রধানত উত্তরবঙ্গের মূল সমস্যা।

ভূ-তত্ত্ববিদদের মতে, হিমালয় এখনও তার নিজের ভেতরে রূপান্তর ঘটিয়ে চলেছে। পাহাড়ে ধস নামে তার অভ্যন্তরীণ কঠিন চাপ, পরিবর্তনশীল আবহাওয়া, অতি-বৃষ্টিপাত, বনাঞ্চল নির্মূল করা, খনিজ পদার্থ যেমন ডলোমাইট, চুনাপাথর তোলা ও ডিনামাইট ইত্যাদির মাধ্যমে পাথর ভাঙার জন্য।

- **তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প শিলিগুড়ি পৌরসভার অধীন জনসাধারণের পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছে।**
- **ফ্লাসিং ব্যবস্থার মাধ্যমে জলপাইগুড়ি শহরে করলা নদীর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ দূর করবে।**

সমস্যার সারকথা—তীব্র ব্যাঙ্ক ইরোশন বা ভূমিক্ষয়, কৃষিজমি, চা-বাগান, গ্রাম ও শহরাঞ্চলের নিমজ্জন। জনবহুল এলাকায় নদী তীর উপচে পড়ার কারণে বন্যা ও কৃষি অঞ্চলে বালি জমে ওঠা, নদীর বিস্তৃতির ফলে নতুন জলপথ তৈরি হওয়া, নদীর তলদেশ জেগে ওঠা—প্রভূত পরিমাণে পলি ও নুড়ি-কাঁকড়ের বৃদ্ধি এবং নদীর গতিপথ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পুরনো পথ ছেড়ে মূল নদী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন প্রণালী বা নদীর সৃষ্টি। এ ছাড়া, গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা যেমন রাস্তা ও রেলপথে বেশ বড় আকারে স্থানচ্যুতি। নদীর চড়ায় মানুষের বসবাস ও তার ক্রমাগত বৃদ্ধি, নদীর স্বাভাবিক গতিকে করে রুদ্ধ এবং নদীকে বাধ্য করায় তার গতিপথ পরিবর্তনে। তাছাড়া মানুষেরই সৃষ্ট আরও অন্যান্য নানান বাধা নদীর স্বাভাবিক গতিপথের প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে।

- **তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, খালপাড়ের রাস্তার মাধ্যমে কলকাতা-উত্তরবঙ্গের দূরত্ব ৭০ কিমি কমিয়ে দিয়ে যানবাহনের ব্যয় ও তরল সোনার (জ্বালানি) সাশ্রয় করবে। পাশাপাশি যাতায়াতের সময়ও করবে সংক্ষেপিত।**

সেচ ও জলপথ বিভাগ আরমারড বাঁধ, মাটির বাঁধ, ব্যাঙ্ক রিভেটমেন্ট, স্পার, পর্কোপাইন ইত্যাদি তৈরির মাধ্যমে খরস্রোতা ভয়ংকর নদীর গতিপথ বজায় রাখা, গ্রাম ও শহরে বন্যার প্রচণ্ডতা হ্রাস, ভূমিক্ষয় হ্রাস এবং বিভিন্ন ছোট ছোট প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষিজমিতে জলসেচের কাজ করে চলেছে।

- **নদীর চড়ায় মানুষের বসবাস ও তার ক্রমাগত বৃদ্ধি, নদীর স্বাভাবিক গতিকে করে রুদ্ধ এবং নদীকে বাধ্য করায় তার গতিপথ পরিবর্তনে। তাছাড়া মানুষেরই সৃষ্ট আরও অন্যান্য নানান বাধা নদীর স্বাভাবিক গতিপথের প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে।**

নানা প্রতিবন্ধকতা সামনে রেখেও সেচ ও জলপথ বিভাগ প্রতি বছরই বন্যার মরসুমে জুন মাস থেকে অক্টোবর ডিভিশনাল অফিসগুলিতে নির্দিষ্টভাবে কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের সমস্ত নদীর বন্যার পূর্বাভাস দিয়ে থাকে। এ সমস্ত কাজ করা হয় জেলা কর্তৃপক্ষ ও কেন্দ্রীয় জলসম্পদ আয়োগের মাধ্যমে এবং বন্যার স্পর্শকাতর অঞ্চলের মানুষকে জেলা কর্তৃপক্ষ সেইমত হুঁশিয়ারি দিয়ে থাকেন সতর্ক হবার জন্য।

তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প

বিভিন্ন খালের মাধ্যমে প্রাক-খরিফ (২০০০-২০০১) মরসুমে সেচের বিস্তারিত তথ্য

[এক] তিস্তা-মহানন্দা সংযোগকারী খাল

ক্রমিক সংখ্যা	ডিস্ট্রিবিউটারি/ মাইনরের নম্বর	সেচনালার দৈর্ঘ্য (কিমি)	সেচের জল দেওয়ার দূরত্ব (কিমি)	আংশিক বা পুরোপুরি সেচের জল প্রাপ্তির বিভিন্ন গ্রাম বা মৌজা	চাষের এলাকা (হেক্টর)	ব্লক
১	ডি/১			জঙ্গলমহল, বারপাটিয়া, জলপাইগুড়ি	৮০০	রাজগঞ্জ ও সদর
২	ডি/২	২৯.২৯০	২৪.০০	মান্তাদাড়ি, প্রধানপাড়া, মালিভিটা, ফুলপাড়া, মালিপাড়া, ঢাকুরিভিটা, রাজার বাড়ি, নর্থ বেঙ্গল ফার্ম, গুজরিমারি, মাল্লারবাড়ি, মন্থন	৫০০০	রাজগঞ্জ
				চন্দরপাড়া, বোমাপাড়া, পাতকাটা, বাজিপাড়া, চেওরাপাড়া, রানীনগর, মোহিতনগর ফার্ম, জলারপাড়া, পালপাড়া		জলপাইগুড়ি সদর
				মুরগিভিটা, বটতলা, বেলা কোবা, বাবুপাড়া, গুজরিমারি		রাজগঞ্জ
৩	ডি/২ মাইনর-৩	২৭.০৩	২৪.০০	বাহাদুর, জমাদারপাড়া, চারারপাড়া, পাতকাটা	৪৯৫০	জলপাইগুড়ি সদর
৪	ডি/২ মাইনর-৪	১.৭৪	১.৭৪	পাতকাটা	৭৫	ঐ
৫	ডি/২ মাইনর-৫	৩.৩০	৩.৩০	পাতকাটা	৩০০	রাজগঞ্জ
৬	ডি/৩	৫.২২০	৫.০০	পানাসাগুড়ি, জলারবাড়ি, প্রধানপাড়া	৬০০	ঐ
৭	ডি/৪			কুন্দরদিঘি, লালিতাবাড়ি, ছাট মৌলানিগছ, ভোটপাড়া, লক্ষ্মীজোত, চাকিয়াভিটা	৬০০	ঐ
৮	ডি/৫	১.৫৯০	১.০০	শিমূলগুড়ি	১৫০	ঐ
৯	ডি/৬	১.৪৬০	১.৫০	বিন্নাগুড়ি	১০০	ঐ
১০	ডি/৭	৪.০১১	৩.০০	বিন্নাগুড়ি	৬০০	ঐ
১১	ডি/৮	০.৬১০	০.৬১০	বিন্নাগুড়ি	৪৫	ঐ
১২	ডি/৯	২.৭৮০	২.৭৮০	বিন্নাগুড়ি	৫৩০	ঐ
১৩	ডি/১০	১৩.৯৯০	১০.০০	বিন্নাগুড়ি-সন্ন্যাসীকাটা, কামারভিটা, বলাইগছ, কিসমত সুখানি, নেংটাগছ	১৫০০	ঐ

* ডি > ডিস্ট্রিবিউটারি

১৫,২৫০ হেক্টর

[দুই] করতোয়া তালমা ব্যারেজ

ক্রমিক সংখ্যা	প্রধান খাল/ ডিস্ট্রিবিউটারি নম্বর	সেচনালার দৈর্ঘ্য (কিমি)	সেচের জল দেওয়ার দূরত্ব (কিমি)	আংশিক বা পুরোপুরি সেচের জল প্রাপ্তির বিভিন্ন গ্রাম বা মৌজা	চাষের এলাকা (হেক্টর)	ব্লক
১	বামপাড়ের প্রধান খাল	১৬.১২৩	১৬.১২৩	চান্দের বাড়ি, দধিগছ, সাহেবপাড়া, শালগুড়ি, মেহেন্দীগছ, ঝাকুয়াপাড়া, সহদইপাড়া, মোতটাগছ, চাড়িয়াপাড়া, মাজাবাড়ি, তোতাইগছ, সুখানি, পানিকৌড়ি	১৮২০	রাজগঞ্জ
২	বামপাড়ের প্রধান খালের ডি/১	২.৫৭২	২.৫৭২	মেহেন্দীগছ	১২৯	ঐ
৩	বামপাড়ের প্রধান খালের ডি/২	১৭.৯৫০	১৭.৯৫০	সরকারপাড়া, পাতিলাভাসা, ডাক্তারপাড়া, ঘনশুয়ারবাড়ি, সারিয়াম, হাবুপাড়া, দোয়ারিবাড়ি, ককিরটিপ, ডাকুয়াপাড়া	১৫৬০	ঐ
৪	বামপাড়ের প্রধান খালের ডি/৩	৫.৭৪৬	৫.৭৪৬	আরাজি বেলাকোবা, কিসমত সুখানি	৪৩২	ঐ
৫	বামপাড়ের প্রধান খালের ডি/৩ এ	১.৮৮৮	১.৮৮৮	বলাইগছ	৮৬	ঐ
৬	বামপাড়ের প্রধান খালের ডি/৪	১.৯২০	১.৯২০	সুখানি	২১২	ঐ
৭	ডানপাড়ের প্রধান খাল	৮.৯৮৭	৮.৯৮৭	আমবাড়ি-ফালাকাটা, বিন্নাগুড়ি, সিতাগুড়ি	৫৪০	ঐ
৮	ডানপাড়ের প্রধান খালের ডি/১	৫.০২৬	৫.০২৬	যুগিভিটা, মহানভিটা, বাদলাগছ	৩৬০	ঐ
৯	ডানপাড়ের প্রধান খালের ডি/২	৩.৪৫৫	৩.৪৫৫	আমবাড়ি-ফালাকাটা, মহানভিটা, পাথরঘাটা গধেয়াগছ	৪৪০	ঐ

* ডি > ডিস্ট্রিবিউটারি

৫,৫৭৯ হেক্টর

[তিন] মহানন্দা প্রধান খাল

ক্রমিক সংখ্যা	ডিস্ট্রিবিউটারি নম্বর	সেচনালার দৈর্ঘ্য (কিমি)	সেচের জল দেওয়ার দূরত্ব (কিমি)	আংশিক বা পুরোপুরি সেচের জল প্রাপ্তির বিভিন্ন গ্রাম বা মৌজা	চাষের এলাকা (হেক্টর)	ব্লক
১	ডি/১	৩.১৬৪	০.২৬২	হাতিরাম, লালদাস	৪০০	ফাঁসিদেওয়া
২	ডি/২	১.৮৮০	১.৮৮০	মো : বক্স	১০০	ঐ
৩	ডি/৩	১০.১৪০	৩.৬৩০	খুশিরাম, লেউসি পুকরি	৪০০	ঐ
৪	ডি/৭ আর	১৫.০০০	৪.০০০	কেমাগরি, বড়বিলি ফেটাও বাদ	৩০০	চোপরা

* ডি > ডিস্ট্রিবিউটারি ১২০০ হেক্টর

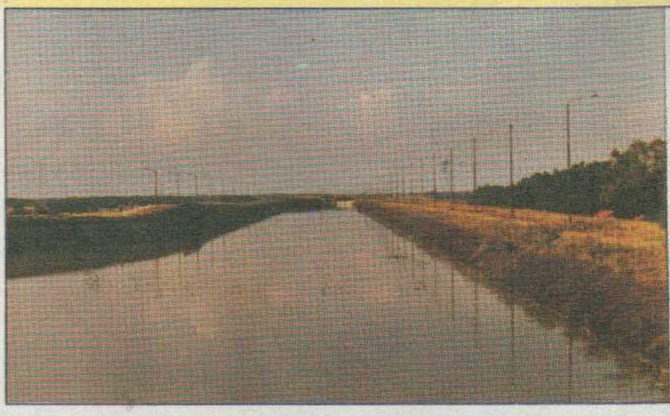

[চার] ডাউকনগর প্রধান খাল

ক্রমিক সংখ্যা	ডিস্ট্রিবিউটারি নম্বর	সেচনালার দৈর্ঘ্য (কিমি)	সেচের জল দেওয়ার দূরত্ব (কিমি)	আংশিক বা পুরোপুরি সেচের জল প্রাপ্তির বিভিন্ন গ্রাম বা মৌজা	চাষের এলাকা (হেক্টর)	ব্লক
১	ডি/১ আর	১০.০১০	৩.০০০	পশ্চিম ছুটিয়াখর, নারায়ণপুর	১৯০	চোপরা
২	ডি/২ এল	১৭.৩৩০	৬.৫০০	পশ্চিম ছুটিয়াখর, বলরামপুর, পিয়াস পোকার ফেটামান	৩০০	ঐ
৩	ডি/৫ আর	১৩.২৭০	৪.০০০	পাওয়া যায়নি	৬০০	ইসলামপুর

* ডি > ডিস্ট্রিবিউটারি ১,০৯০ হেক্টর

সেচের জল বন্টনের সময়সীমা : ১৫ জানুয়ারি থেকে ১৫ মে

বিশ্ববিচিত্রা

কলম্বিয়া-নদী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জলভাণ্ডার, আবার মৎস্যপ্রাণীর গভীর সংকট

জলসম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কলম্বিয়া নদীর রয়েছে একটি অগ্রণী ভূমিকা। মিসিসিপি-মিসৌরী নদীর পরে এটিই এদেশে বৃহত্তম। পার্শ্ববর্তী রাজ্যে কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়ার রকিপর্বতের শৈলশিখর থেকে নির্গত হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে সুদীর্ঘ ২০০০ কিমি পথ পাড়ি দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে এর যাত্রা শেষ। মোট অববাহিকা অঞ্চল প্রায় ৫,৭০,০০০ বর্গকিমি ধরে পরিব্যাপ্ত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পশ্চিমের সাতটি অঙ্গরাজ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। এর জলসম্পদের পরিমাণ আনুমানিক ১৯.৭৪ মি.হে.মি। প্রধান উপনদীটির নাম স্নেক রিভার। প্রায় দুশো বছর আগে তদানীন্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি টমাস জেফারসনের উদ্যোগে প্রখ্যাত আবিষ্কারক লুইস ও ক্লার্ক এই নদীটির সন্ধান পান। এর পরে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এর প্রভূত জলসম্পদ ব্যবহার করে কলম্বিয়া ও তার শাখানদীসমূহের বিভিন্ন স্থানে বাঁধ নির্মাণ করে তৈরি হল বৃহৎ সেচ ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। মাটির ঢাল খুব খাড়াই হওয়ায় (০.৩৮ প্রতি হাজারে) জলবিদ্যুৎ তৈরিতে প্রভূত সহায়তা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক-তৃতীয়াংশ জলবিদ্যুৎ এখানেই তৈরি হয়। কলম্বিয়া নদীর উপরে ১৪টি এবং সমগ্র অববাহিকায় নির্মিত হয়েছিল ২৫০টি বাঁধ। এদের মাধ্যমে জলবিদ্যুৎ ছাড়াও রয়েছে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সেচব্যবস্থা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ। প্রধান বাঁধটির নাম গ্রান্ড কুলি (Grand Coulee)। ১৯৪১ সালে এর নির্মাণকাজ শেষ হয়। ২,৫৯,১০৯ হে (৬,৪০,০০০ একর) জমিতে সেচের

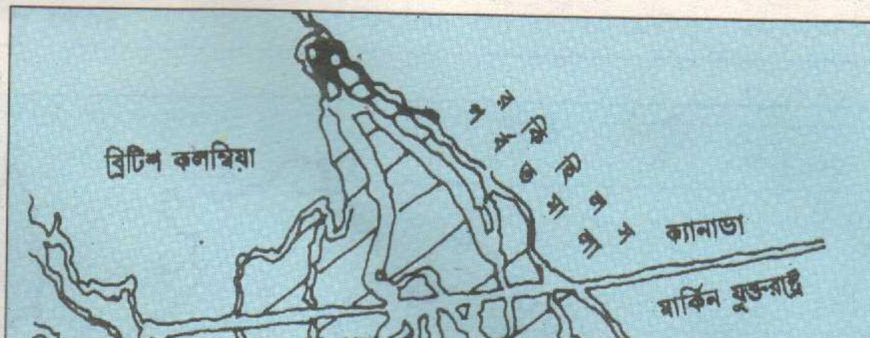

জল সরবরাহ ছাড়া এর জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা ৬০০ মেগাওয়াট। বনভিল (Bonneville) আর একটি উল্লেখযোগ্য বাঁধ। তবে এই সুবৃহৎ প্রকল্প রূপায়ণের পরে, এখানের স্যালমন মৎস্যপ্রাণীদের প্রাণান্তকর অবস্থা দাঁড়িয়েছে। নদীর উজানে ১৫০০ কিমি পথ পরিক্রমা করে নদীতে এরা ডিম পাড়ে। অনেক বাঁধে মৎস্য সোপান (Fish Ladder)-এর ব্যবস্থা না থাকায় এদের সংখ্যা দ্রুত কমে আসছে। ৬০ বছর আগে স্যালমন মাছের সংখ্যা ছিল ১৫ থেকে ২০ মিলিয়ান, এখন এটা কমে দাঁড়িয়েছে মোটে ২ থেকে ৩ লক্ষ। শতকরা ২-ভাগের থেকেও কম। মৎস্যজীবীরাও গভীর সঙ্কটে। পরিবেশবিদ, প্রযুক্তিবিদগণ এর প্রতিকার নিয়ে চিন্তাভাবনা করছেন।

জলসম্পদ ব্যবহারে অস্ট্রেলিয়া

বিশাল দেশ অস্ট্রেলিয়া। ৭৭ লক্ষ বর্গ কিমির উপর আয়তনবিশিষ্ট এই দ্বীপ মহাদেশটি ভারতের প্রায় আড়াইগুণ, তবে এর জলসম্পদের পরিমাণ খুবই কম। শতকরা ৪০ ভাগই মরু অঞ্চল। দেশের অনেকাংশে আর্তেজিয় কূপের মাধ্যমে সেচের ব্যবস্থা করা হয়। প্রধান জলসম্পদের উৎস মারে নদী। ডারলিং, লাচলান ইত্যাদি উপনদী নিয়ে এই নদীটির বিস্তীর্ণ অববাহিকা অঞ্চলের পরিমাণ ১০.৭৫ লক্ষ বর্গ কিমি। কুইসল্যান্ডের গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জ পর্বতমালা থেকে বেরিয়ে প্রায় ২৬০০ কিমি পথ পাড়ি দিয়ে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার এডিলেড শহরের কাছে ভারত মহাসাগরে নির্গত হয়। নদীটির সর্বাধিক প্রবাহের পরিমাণ ২৭,০০০ কিউমেক বা ৯.৫৫ লক্ষ কিউসেক। মারে-ডার্লিং উপত্যকার মাধ্যমে বিরাট সেচপ্রকল্প নিউ সাউথ ওয়েল্স ও ভিক্টোরিয়া প্রদেশের বিস্তীর্ণ তৃষিত অঞ্চলে সেচের জল সরবরাহ করে। প্রধান বাঁধটির নাম হিউম ড্যাম। সেচ ছাড়াও উৎপন্ন হয় জলবিদ্যুৎ। নদী অববাহিকার জলসম্পদের যথার্থ ব্যবহারের প্রয়াসে অস্ট্রেলীয় সরকার তৈরি করেছেন মারে-ডার্লিং অববাহিকা পর্যদ। জলের যথার্থ সদ্ব্যবহার, জলের মান, জল সংরক্ষণ এবং সামগ্রিক সামাজিক উন্নয়নের কাজে এই পর্যদ ব্যবস্থা নেয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন বড় নদীতে বন্যাপ্রবাহ

পৃথিবীর বিভিন্ন নদীতে বিভিন্ন সময়ে বেশ বড় ধরনের বন্যা প্রবাহিত হয়েছিল। এর একটা পরিসংখ্যান নিচের সারণিতে তুলে ধরা হল :

নদীর নাম	দৈর্ঘ্য (কিমি)	দেশ	অববাহিকা অঞ্চল (বর্গকিমি)	সর্বাধিক কিউমেক	বন্যাপ্রবাহ কিউসেক
নীল	৬৬৫৩	সুদান, মিশর	৩০,০০,০০০	১৩,৫০০	৪,৭৬,৬৮৫
আমাজন	৬২৭৯	পেরু, ব্রাজিল	৬৪,৭৫,০০০	৪,২০,২৩৭	১,৪৮,৩৮,৫৫৭
মিসিসিপি-মিসৌরী	৬২১৫	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	২৩,৮৭,৯৫০	৭০,৭৯২	২৫,০০,০০০
ইয়াংসি	৫৫২২	চীন	—	৮৪,৯৫০	৩০,০০,০০০
লেনা	৪২৭১	রাশিয়া	২৪,৩০,০০০	১,৯৪,০০০	৬৮,৫০,১৪০
মেকং	৪১৮৬	চীন, থাইল্যান্ড, কাম্বোডিয়া	৬,৪৬,০০০	৭৫,৭০০	২৬,৭২,৯৬৭
ইনিসি	৪১৩১	রাশিয়া	২৪,৪০,০০০	১,৩২,০০০	৪৬,৬০,৯২০
ভলগা	৩৬৯২	রাশিয়া	৩৪,৯৬,৫০০	৫১,৯০০	১৮,৩২,৫৮৯
ব্রহ্মপুত্র	২৮৯৮	চীন, ভারত, বাংলাদেশ	৯,৩৪,৯৯০	৭৩,৬২০	২৫,৯৯,৫২২
গঙ্গা	২৫৭৬	ভারত, বাংলাদেশ	১০,৭৩,০৭০	৭৬,৪৬৬	২৭,০০,০০০

উপরের তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে আমাজন নদীর অববাহিকা অঞ্চল পৃথিবীর বৃহত্তম। সমগ্র ভারতবর্ষের আয়তনের প্রায় দ্বিগুণ। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জল বহন করে আমাজন। ব্রাজিলে বেলেম শহরের কাছে যেখানে আটলান্টিক মহাসাগরে পড়ছে, সেখানে একদিনের বন্যাপ্রবাহ ৮ x ১০^{১২} গ্যালন বা ১,৪৮,৩৮,৫৫৭ কিউসেক। এই প্রবাহ এতই বেশি যে সমুদ্রে নির্গত হবার পরেও ১০০ কিমি পর্যন্ত সমুদ্রের জল সুমিষ্ট থাকে এবং মোহনা অঞ্চলে কোনও ব-দ্বীপ সৃষ্টি হয়নি।

একনজরে পৃথিবীর জলসম্পদ এবং তুলনামূলকভাবে ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ

জলই জীবন। পৃথিবীর বয়স ৪৬০ কোটি বছর হয়ে গেল। অতীতে ভাগ্যক্রমে আবহমণ্ডলে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসের সংঘাতে সৃষ্টি হয়েছিল জল। তার পরে সমুদ্র সৃষ্টি হল। সমুদ্র অবশ্য প্রথমে ছিল অগভীর। প্রায় ১৬ কোটি বছর আগে সমুদ্রের ব্যাপ্তি ও গভীরতা বৃদ্ধি পেল। পৃথিবীর জলসম্পদ প্রচুর। এর পরিমাণ দেখলে মনে হবার কারণ নেই যে কোনোদিন জলের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। রাষ্ট্রসংঘের সমীক্ষায় পৃথিবীর মোট জলসম্পদের পরিমাণ ১৪০০ মিলিয়ান ঘন কিমি। এই প্রভূত পরিমাণ জল স্থলভাগের উপরে ৩০০০ মি. বেষ্টনী সৃষ্টি করতে পারে। সমুদ্র পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ স্থান অধিকার করে আছে এবং এখানেই আবদ্ধ আছে পৃথিবীর ৯৭% জল। কিন্তু এই জল লবণাক্ত এবং ব্যবহারের অনুপযুক্ত। বিশুদ্ধ জলের পরিমাণ ২.৭

শতাংশ। কিন্তু এর ৭৫.২ শতাংশ মেরু অঞ্চলে বরফ হয়ে জমে রয়েছে। ২২.৬ শতাংশ আবদ্ধ রয়েছে ভূগর্ভে। এই ভূগর্ভের একটা অংশ অবশ্য ব্যবহার করা যায়। তবে অনেকটাই শিলাস্তরের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে থাকায় ব্যবহার্য সম্ভব হয়ে ওঠেনি। বিশুদ্ধ ও সুমিষ্ট এই জলের উৎস হচ্ছে হ্রদ, নদী, জলাশয় ইত্যাদি। নদীস্রোতের মাধ্যমে এবং বাষ্পীভবন ও ঘনীভবনের কারণে এর অনেকটাই আবার সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। পৃথিবীতে তাই এই বিশুদ্ধ জলের পরিমাণ আনুমানিক ১৫ লক্ষ ঘন কিমি। পৃথিবীর জলসম্পদের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি ব্রাজিল—১৭%, এরপরে আছে রাশিয়া—১১%, কানাডা—৭%, চীন—৭%, ইন্দোনেশিয়া—৬%, বাংলাদেশ—৬%, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—৬%, ভারত—৫% এবং অন্যান্য দেশ ৩৫%। চীন ও কানাডার জলসম্পদের পরিমাণ প্রায় সমান, কিন্তু কানাডার জনসংখ্যা চীনের ২.৫%। কালাহারি মরু অঞ্চলে বৎসোয়ানা দেশে প্রতিটি জলবিন্দু এতই অমূল্য যে তাদের দেশের মুদ্রার নাম তাদের সেৎসোয়ানা ভাষায় 'পুলা' রাখা হয়েছে, যার অর্থ জল। জলসম্পদের পরিমাণ অনুযায়ী, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যবহারও বিভিন্ন প্রকার। সাহারা অঞ্চলের প্রায় মরু প্রধান দেশগুলোতে যেখানে জল ব্যবহারের পরিমাণ মাথাপিছু প্রতিদিন কেবলমাত্র ১০ থেকে ১২ লিটার, ইউরোপীয় দেশগুলোতে এর পরিমাণ ২০০ লিটার। গত তিনশতকে পৃথিবীতে জলের ব্যবহার ৩৫ গুণ বেড়ে গিয়েছে। বছরে এর ব্যবহার আনুমানিক ৩২৪০ ঘন কিমি। এর মধ্যে ৬৯% ব্যবহৃত হয় কৃষিকাজে, ২৩% ভাগ শিল্পে এবং ৮% ভাগ গৃহস্থলির কাজে

পৃথিবীর জনসংখ্যার ১৬% ভারতবর্ষে, স্থলভাগের পরিমাণ ২.৪৫% এবং জলসম্পদ ৪% ভাগ ভারতবর্ষে মোট জলসম্পদের পরিমাণ আনুমানিক ১৯৫৩ ঘন কিমি। এর মধ্যে ব্যবহারযোগ্য ভূপৃষ্ঠ জলের পরিমাণ ৬৯০ ঘন কিমি এবং ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাণ ৩৯৬ ঘন কিমি। সমীক্ষায় দেখা গেছে ভূপৃষ্ঠ জলের প্রায় ৮৭% ভাগই সমুদ্রে গিয়ে পড়ে এবং বন্যা ঘটিয়ে বিপর্যয় নিয়ে আসে। সেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, শিল্প, গৃহস্থালির কাজে কেবলমাত্র ১৩% অংশই ব্যবহৃত হয়।

রাজস্থান ভারতবর্ষের সবচেয়ে শুষ্ক রাজ্য। আয়তনে সারা দেশের ১০.৪১% স্থান জুড়ে থাকলেও সলসম্পদের পরিমাণ কেবলমাত্র ১%। এই জলও রয়েছে ভূগর্ভে, অল্প বৃষ্টির মাধ্যমে।

পশ্চিমবঙ্গ আয়তনে ভারতবর্ষের ২.৭% হলেও জলের পরিমাণ ৭.৫%। রাজ্যে ভূ-পৃষ্ঠের জলের পরিমাণ ১৩.২৯ মি হেমি এবং ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাণ ১.৪৬ মি হেমি। জলের ব্যবহার ও চাহিদা প্রভূত পরিমাণ বৃদ্ধি এর যথার্থ সংরক্ষণ যেমন দরকার, অপচয় দূর করাতেও সর্বাগ্রে প্রয়াস নেওয়া প্রয়োজন। কারণ এর পরে পেট্রোলিয়ামের মতো প্রতিবিন্দু জলও মহার্ঘ হয়ে দাঁড়াবে। তাই জলের এখন নামকরণ হয়েছে **blue gold** বা নীল সোনা।

সংকলক : অঞ্জন দাশগুপ্ত, অধীক্ষক বাস্তুকার

বিজ্ঞপ্তি

ভারত সরকারের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলীর (১৯৫৬) ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত তথ্যগুলি প্রকাশ করা হল :

ক) *পত্রিকার নাম*	:	সেচপত্র
খ) *পত্রিকার ভাষা*	:	বাংলা
গ) *প্রকাশের স্থান*	:	জলসম্পদ ভবন, বিধাননগর, কলকাতা—৭০০ ০৯১
ঘ) *প্রকাশ কাল*	:	ত্রৈমাসিক
ঙ) *মুদ্রাকরের নাম*	:	রণজিৎকুমার নাগ
চ) *মুদ্রাকরের জাতি ও ঠিকানা*	:	ভারতীয়, জলসম্পদ ভবন, বিধাননগর, কলকাতা—৭০০ ০৯১
ছ) *প্রকাশকের নাম ও ঠিকানা*	:	রণজিৎকুমার নাগ, জলসম্পদ ভবন, বিধাননগর কলকাতা—৭০০ ০৯১
জ) *সম্পাদকের নাম, জাতি ও ঠিকানা*	:	চন্দন রায়, ভারতীয়, জলসম্পদ ভবন, বিধাননগর, কলকাতা—৭০০ ০৯১
ঝ) *স্বত্ত্বাধিকারী*	:	সেচ ও জলপথ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
ঞ) *স্বত্ত্বাধিকারীর ঠিকানা*	:	জলসম্পদ ভবন, বিধাননগর, কলকাতা—৭০০ ০৯১

আমি, শ্রীরণজিৎকুমার নাগ এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বাক্ষর : রণজিৎকুমার নাগ

সেচ ও জলপথ দপ্তরের বিভিন্ন অফিসের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

কেন্দ্রীয় নকশা করণের অনুষ্ঠান

গত তিন বছর ধরেই সেচ ও জলপথ দপ্তরের কেন্দ্রীয় নকশা করণ অফিসের বাৎসরিক মিলনোৎসব অনুষ্ঠানটিকে ঘিরে একটি সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে চলেছে। এবারেও ব্যতিক্রমী এই অনুষ্ঠানটি ছিল খুবই আশাব্যঞ্জক। অনুষ্ঠানটির শুরু হয় স্বাভাবিকভাবেই উদ্বোধনী সংগীতের মধ্য দিয়ে। এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন সজল গুহ, শান্তনু সেন মজুমদার, বিপ্লব মুখার্জি, শীলা রায়, শান্তা গাঙ্গুলী প্রমুখ। তবলায় সহযোগিতা করেন অশোক পাল ও যন্ত্রানুষঙ্গে তপন দাস। অনুষ্ঠানের সভাপতি কেন্দ্রীয় নকশা করণ অফিসের আধিকারিক অঞ্জন দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁর ভাষণে এই মিলন মেলায় যোগদানের জন্য সবাইকে অভিনন্দন জানান।

এ দিন শিশুশিল্পী শতম গুঁইয়ের নজরুলের কবিতা আবৃত্তি শ্রোতাদের বহুদিন মনে থাকবে। তবে অনুষ্ঠানের সেরা প্রাপ্তি ছোট্ট মেয়ে মৌমিতা মণ্ডলের নৃত্য পরিবেশন। শিশুশিল্পী মাধুরী মান্না এবং তরুণ সহ-অধিকর্তা বিপ্লব মুখার্জির গানও ছিল অনবদ্য। বিশ্বনাথ গুপ্ত ও অশোক বশিষ্ঠ ভিন্ন স্বাদের কিছু কবিতা পাঠ করেন।

কেন্দ্রীয় নকশাকরণের অনুষ্ঠানে বাঁদিক থেকে তপন দাস, অশোক পাল, সজল গুহ এবং বিপ্লব মুখার্জি

মেদিনীপুরে সুবর্ণরেখা ব্যারেজ প্রকল্পের 'কবি প্রণাম'

মেদিনীপুরে সুবর্ণরেখা ব্যারেজ প্রকল্পের মাননীয় মুখ্য বাস্তুকারের প্রশাসনিক ভবনে এক মনোরম পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত স্মরণে 'কবি প্রণাম'। এ দিনের অনুষ্ঠানে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন মাননীয় মুখ্য বাস্তুকার জ্যোতিপ্রকাশ চৌধুরী। এক সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর শুরু হয় এদিনের অনুষ্ঠান। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন মধুমিতা সামন্ত, পুষ্পিতা সামন্ত এবং অমিতা মণ্ডল। এ ছাড়া স্বরচিত কবিতা, রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, রবীন্দ্রনাথ এবং সুকান্তের কবিতা আবৃত্তি ও পরিশেষে রবীন্দ্রনাথের একাঙ্ক নাটক 'খ্যাতির বিড়ম্বনা' ছিল এ দিনের অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ।

এই নাটকে অংশগ্রহণ করেন শিশিরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, শিবকুমার চৌধুরী, দেবাশিস চ্যাটার্জি, মানস গুহ, জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী, তপন পাইক, বিনোদবিহারী হাজরা, কাশীনাথ দালাল, রাধাগোবিন্দ সাহা, লালমোহন পড়ুয়া, প্রশান্ত মণ্ডল, কার্তিক দাস ও ভক্তিভূষণ চক্রবর্তী প্রমুখ। এদের অনেকেরই অভিনয় মনে রাখার মতো।

এ দিনের উদ্যোক্তা উত্তম পুরকাইতের কণ্ঠে কবি দিলীপ দত্তের কবিতা আবৃত্তি ছিল শোনার মতো। রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতিতে অংশ নেন বেতার শিল্পী জয়ন্ত সাহা এবং সর্বাণী হালদার। এ ছাড়া দেবযানী রায়, সবিতা দত্ত, পূর্ণিমা চ্যাটার্জি, মধুমিতা সামন্ত, পুষ্পিতা সামন্ত, গোপাল দাস, সুকুমার কর্মকারের কণ্ঠে রবীন্দ্র-নজরুল সংগীত খুবই সুন্দর হয়েছিল। অনুষ্ঠানে গীটার বাজিয়ে শোনান স্বপন রজক। অনুষ্ঠানটির ঘোষণায় ছিলেন প্রদীপ বসু।

সুবর্ণরেখা বাঁধ প্রকল্প : সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০০১ বুধবার সুবর্ণরেখা বাঁধ প্রকল্পের কর্মচারিবৃন্দের প্রযোজনা এবং পরিচালনায় মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর হলে অতিথি-অভ্যাগত, কর্মচারিবৃন্দ এবং তাঁদের পরিবার-পরিজনের উপস্থিতিতে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে এক উপভোগ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সমবেত-সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। সভাপতি মুখ্য বাস্তুকার শ্রীজ্যোতিপ্রকাশ চৌধুরী, মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর কর্মচারী এবং তাঁদের পরিজনদের সুমধুর কণ্ঠের আবৃত্তি এবং সংগীত এক ভাবাবেশ তৈরি করে।

এই আনন্দঘন পরিবেশের মধ্য দিয়েই মঞ্চস্থ হয় শ্রীশৈলেন গুহনিয়োগীর হাস্যরসাত্মক নাটক 'ফাঁস'। নাটকে প্রকল্পের কর্মচারীরাই বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেন। নাট্য-নির্দেশক শিশিরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও সমগ্র অনুষ্ঠানটির সুনিপুণ সঞ্চালক উত্তম পুরকাইত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সুবর্ণরেখা বাঁধ প্রকল্পের কর্মচারিবৃন্দ আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করছেন বেতার শিল্পী শ্রীমতী সর্বাণী হালদার।

এত বন্যা কেন ?

জ্যোতিপ্রকাশ চৌধুরী □ *মুখ্য বাস্তুকার, সেচ ও জলপথ বিভাগ*

আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে
বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে।
....
আষাঢ়ে বাদল নামে, নদী ভরো ভরো—
মাতিয়া ছুটিয়া চলে ধারা খরতর।
মহাবেগে কলকল কোলাহল ওঠে,
ঘোলা জলে পাকগুলি ঘুরে ঘুরে ছোটে।
দুই কূলে বনে বনে প'ড়ে যায় সাড়া,
বরষার উৎসবে জেগে ওঠে পাড়া।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই ছোট কবিতাতেই রয়েছে—তখনও, প্রায় ১০০ বৎসর পূর্বে নদীতে বাৎসরিক বন্যা ছিল। কিন্তু সেই বন্যা মানুষের ভয় বা ত্রাসের সৃষ্টি করেনি, তাকে ঘরছাড়া করেনি, বরঞ্চ তা ছিল আনন্দের, উৎসবের।

ভৌগোলিকভাবে ধরতে গেলে, প্রায় অর্ধেক পশ্চিমবঙ্গই 'বন্যাপ্রবণ' বলে চিহ্নিত। নগরায়নের সঙ্গে সঙ্গে বন্যা প্রতিরোধেরও বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা চলতে থাকে। কিন্তু নদীকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করতে হলে, নদীর উৎপত্তিস্থল থেকে শুরু করে নদীর সম্পূর্ণ অববাহিকায় বিভিন্ন ব্যবস্থার প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের এই রাজ্য থেকে তা কতটুকু করা সম্ভব ? প্রায় সব নদীই ভিনদেশ বা ভিনরাজ্য থেকে উৎপত্তি হয়েছে, আবার অনেকগুলোই ভিনদেশে গিয়েই শেষ হয়েছে। ভিনরাজ্য বা ভিনদেশের অধিক বৃষ্টিপাত, ভূমিক্ষয় ইত্যাদি প্রাকৃতিক অশনিজনিত কুফল আমাদের এই ছোট রাজ্যকেই বইতে হয়। তাই আমাদের অংশের নদীর পাড় বা তার কাছাকাছি অংশ ধরেই মূলত বন্যা প্রতিরোধের প্রায় সব ব্যবস্থাদি চলে।

প্রথমদিকে ছিল, নদীর পাড় থেকে অনেক দূরত্ব রেখে নদীবাঁধ হত। অনেক জায়গায় নদীবাঁধ হত একদিকে অর্থাৎ যেখানে জনবসতি বেশি, যা ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদিতে শহর-গঞ্জ গড়ে উঠেছে। জনবসতি বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে নদীবাঁধকেও আর নদীর পাড় থেকে বেশি দূরে রাখা যাচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে—এক পাড়ে কেন, দুই পাড়েই নদীবাঁধ করতে হয়েছে। জমি তো সীমাবদ্ধ, তাই বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, শিল্পনগরী ইত্যাদি সব কিছু স্থাপনে, জমির প্রয়োজন বৃদ্ধিতে একদিকে যেমন 'বন কেটে বসতি' বা চাষযোগ্য জমি তৈরি হয়েছে, অন্যদিকে নদী, খাল, বিল—তার উপরও চাপ সৃষ্টি হয়েছে। ছোট বড় পুকুর, জলাশয় ভর্তি হয়ে গিয়েছে। বলতে কী, লবণ হ্রদকে ভরাট করেই তো সর্বজনবিদিত 'বিধাননগর' সৃষ্টি হয়েছে।

এমনকী মানুষের প্রয়োজনে, পরিমিত ভরাটের জন্য অপেক্ষা না করে সুন্দরবন এলাকায় বা ভূতনি-দিয়ারায় জনবসতি গড়ে উঠেছে। নদীর খেলা করার জায়গা ধীরে ধীরে দখল করে নিয়ে আমরা নদীকে শাসন করতে চাইছি। তা ছাড়া আমাদের প্রয়োজনে খোদ নদীর বুকের উপরেও তো কম কর্মকাণ্ড চলছে না !

নদীর খাত আজ ভূমিক্ষয়জনিত পলিতে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। কোথাও কোথাও পাশের জমি থেকেও নদীর তলদেশ উঁচু হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। সর্বত্রই জমির মাটি বৃষ্টির জলের সঙ্গে ধুয়ে ধুয়ে নদীতে গিয়ে পড়ছে। নদীর দুই পাড়ে যদি, যেমন শাড়ির পাড় থাকে, তেমন বৃহৎ-বৃক্ষ-বনানী, থাকত অনেক মাটি তাহলে আটকে যেত। নদীর খাতগুলি এত তাড়াতাড়ি ভরাট হয়ে যেত না। যে বিপুলভাবে নদীর খাতগুলি আজ পলি আকীর্ণ, তা তোলা সম্ভব হলেও রাখার বোধকরি জায়গা সঙ্কুলান হবে না। কী বিশাল অর্থ, প্রক্রিয়া ও কর্মকাণ্ডের প্রয়োজন ! আর তা ছাড়া বৃহৎ-বৃক্ষ-বনানী রহিত পাড় থাকলে নদীখাত আবার ভরাট হয়ে যেতেও বেশি দিন সময় নেবে না। বন্যার মাধ্যমে প্রকৃতি-তাড়িত যে স্বাস্থ্যকর পর্যায় বলে একদিন যা বিবেচিত হত, তাও আজ অপাঙক্তেয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। নদীর সাবলীল গতি আজ বিভিন্নভাবে রুদ্ধ, বাধাপ্রাপ্ত।

অনেকে বলে থাকেন, বৃষ্টির জল থেকেই তো বন্যা হচ্ছে, তাই আমরা যদি বৃষ্টির জল ধরে রাখতে পারি, তবে তো আর বন্যা হবে না। খুবই ভাল কথা, কিন্তু বৃষ্টির জল কোথায় ও কীভাবে রাখা যাবে ? জল ধরে রাখতে গেলে তো জমির প্রয়োজন—অনেক ছোট-বড় বাঁধ, পুকুর, জলাশয় ইত্যাদি করতে হবে। এই ছোট্ট রাজ্যে বিভিন্নভাবে জমির ব্যবহার করে, কতটুকু জমি এইসব বাঁধ, জলাশয়ের জন্য অবশিষ্ট থাকবে। যেখানে পূর্বস্থিত পুকুর, জলাশয় ভর্তি হয়ে যাচ্ছে, সেখানে এই বিপুল সংখ্যক পুকুর-জলাশয় নতুন করে তৈরি করা কষ্টকল্পিত হবে না তো ?

তাই আমাদের সবাইকেই ভাবতে হবে, বন্যা নিবারণে আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে সহযোগী হয়ে উঠতে পারি, যেন সমস্যার মূল থেকে আমরা এগোতে পারি ; আমরা যেন আবার ঘরের দাওয়ায় বসে নিশ্চিন্ত মনে ছেলেবেলার উপরিউক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করতে পারি।

.... দুই কূলে বনে বনে প'ড়ে যায় সাড়া,
বরষার উৎসবে জেগে ওঠে পাড়া।

প্রকাশিত হচ্ছে
গত ৬ বছরের
সেচপত্র থেকে
নির্বাচিত রচনার
এক উল্লেখযোগ্য
সংকলন

বিকেন্দ্রীয় ব্যবস্থার অধিক সুদৃঢ়করণ ও বিস্তৃতির লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগের সচিব স্বাক্ষরিত নিম্নোক্ত বিজ্ঞপ্তিটি প্রচার করা হল :

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সেচ ও জলপথ বিভাগ

জলসম্পদ ভবন, লবণ হ্রদ

গণন শাখা

কলকাতা-৯১

নং ৬৩-আই এ তাং-১৭/১১/২০০০

বিজ্ঞপ্তি

(১) গ্রাম ও শহরাঞ্চলে দ্রুত আর্থিক উন্নয়ন এবং সামাজিক ন্যায়পরতা সুনিশ্চিত করার অভিলক্ষ্যে এবং নির্বাচিত পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে ও পৌরসভার মাধ্যমে শহর এলাকায় প্রকল্প রূপায়ণের কাজে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণকারী বিকেন্দ্রীয় ব্যবস্থাটির অধিক সুদৃঢ়করণ ও বিস্তৃতিকরণের জন্য জেলাস্তরের সেচ ও জলপথ বিভাগের বাস্তুকার আধিকারিকগণ তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থা ও কর্মচারীবৃন্দ সহ, জেলা ও উপজেলা স্তরে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় প্রশাসনের দ্বারা ন্যস্ত সেচ সম্ভাবনা সৃষ্টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেই সম্পর্কিত প্রকল্প রূপায়ণে সক্রিয় থাকবেন জেলা ও উপজেলা স্তরে বাস্তুকার আধিকারিকবৃন্দ তাদের অধীনস্থ সংস্থাসমূহসহ বিভাগীয় দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বিভাগ কর্তৃক বর্তমানে ও আগামী দিনের জন্য বলবৎ ও পরিগৃহীত কর্মধারা, নিয়মনীতি, আইন ও অনুজ্ঞা অনুসারে স্থানীয় প্রশাসনের প্রয়োজনীয় কর্মসম্পাদন করবেন। বিভাগীয় কর্মসম্পাদন ব্যতিরেকে তারা শুধু স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষে বা স্বার্থেই কার্যপালনে বাধ্য থাকবেন। স্থানীয় প্রশাসনের তরফে এই ধরনের প্রকল্প রূপায়ণ ও তার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন পদে নিযুক্ত বিভাগীয় আধিকারিক ও কর্মচারীদের অনুসৃত কর্মপন্থা হবে নিম্নরূপ :

(২) সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত/ পৌরসভা/ পৌর কর্পোরেশন/ জেলা/ মহকুমা পরিষদ সেচ ও জলপথ বিভাগের নির্বাহী বাস্তুকারদের তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন কর্মী ও প্রতিষ্ঠান সহ, বিভাগে তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রাধিকারের সঙ্গে সাজুয্য রেখে সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট কাজ, প্রকল্প পরিকল্পনা ও রূপায়ণের দায়িত্ব প্রদান করবে।

সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত/ পৌরসভা/ পৌর কর্পোরেশন/ জেলা/ মহকুমা পরিষদের অনুমোদন লাভের পর সেচ ও জলপথ বিভাগের নির্বাহী বাস্তুকারেরা স্থানীয় প্রশাসনের স্বার্থে তাদের সামগ্রিক তত্ত্বাবধানে, বিভাগের দ্বারা ইতিমধ্যেই ন্যস্ত প্রাধিকার ও ক্ষমতার সদর্থক ব্যবহার ঘটিয়ে প্রচলিত নিয়ম ও আদেশক্রম পালন করে কর্মসম্পন্ন করবেন। এই কর্মভারপ্রাপ্তদের সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের ' ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী বাস্তুকার' এই অতিরিক্ত পদনাম প্রদানপূর্বক পঞ্চায়েত/ পৌরসভা/ পৌর কর্পোরেশন ইত্যাদি সংস্থায় তাদের প্রতিষ্ঠা ও নিকট সম্পর্ককে তুলে ধরা হবে। সংস্থার কর্তাস্থানীয় ব্যক্তিরা এই ধরনের প্রকল্প রূপায়ণে তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা পালন করবেন এবং এই পরিষেবা থেকে সর্বোচ্চ উপযোগিতা প্রাপ্তির লক্ষ্যে জেলায় অবস্থিত বিভিন্ন বিভাগীয় অধিকর্তার কাজে সহায়তা প্রদান করবেন।

(৩) অন্য আরেকটি সরকারি আদেশনামা অনুসারে পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন বিভাগ/ পৌরবিভাগ সেচ ও জলপথ বিভাগকে প্রদত্ত অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার অনুরূপ ক্ষমতা প্রদান করবে জেলা ও উপজেলা স্তরে অনুমোদিত বাস্তুকারদের। তাদের ওপর ন্যস্ত প্রকল্প রূপায়ণের কাজে সেই প্রাপ্ত ক্ষমতার প্রয়োগ ঘটিয়ে তারা সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ/ সমিতি/ মহকুমা পরিষদ/ পৌরসভা/ পৌর কর্পোরেশন ইত্যাদির পক্ষে ও স্বার্থে কর্মসহায়তা দান করবেন।

(৪) প্রকল্প পরিকল্পনা ও রূপায়ণের বিষয়টি জেলা পরিষদের স্থায়ী সমিতি এবং পৌর বিভাগের দ্বারা বিজ্ঞাপিত পৌরসভা/ পৌর কর্পোরেশনের অধীনস্থ অনুরূপ সমিতির দ্বারা পর্যবেক্ষিত হবে। সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পসমূহ যার ক্ষেত্রাধিকারের অন্তর্গত, বিভাগের সংশ্লিষ্ট মণ্ডলের সেই অধীক্ষক বাস্তুকারকে, এই ধরনের উপসমিতি/ স্থায়ী সমিতির অধিবেশনে একজন বিশেষজ্ঞের ভূমিকা পালনের জন্য, আমন্ত্রিত সভ্য হিসেবে গণ্য করা যাবে, সমিতির কাজ হবে—প্রকল্প নির্বাচন, জেলা পরিষদ/ পৌরসভা/ পৌর কর্পোরেশনের কাছ থেকে প্রশাসনিক অনুমোদন লাভ, চুক্তির শর্ত ও সীমা নির্ধারণ, কাজের অগ্রগতির দেখভাল, চুক্তি অনুযায়ী যে কোনো নিযুক্তকের বিরুদ্ধে নির্ধারিত সময়সীমায় নির্দিষ্ট কার্যাদি সম্পাদনে ব্যর্থতার অভিযোগে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদির জন্য সুপারিশ—অর্থবিভাগ এবং সেচ ও জলপথ বিভাগের বিধি অনুমোদিত সীমা অতিক্রান্ত ব্যয়ভারের সমর্থনে সংশোধিত প্রশাসনিক অনুমোদনের প্রস্তাব অধিগ্রহণের সুপারিশ ও বিভাগীয় নির্বাহী বাস্তুকারের সমর্থিত অনুপূরক দরপত্রের অতিরেকে অতিরিক্ত অথবা/

এবং বিকল্প কার্যভার গ্রহণের অনুপূরক দরপত্র অনুমোদনের সুপারিশ করা, সমিতির সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে জেলা পরিষদ/ পুরসভা/ পৌর কর্পোরেশন যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং সংশ্লিষ্ট ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী বাস্তুকারকে গৃহীত কার্যক্রম সম্বন্ধে অবহিত করবে।

(৫) জেলা পরিষদ/ পুরসভা / পৌর কর্পোরেশনের অনুরোধক্রমে প্রকল্পের কাজে নির্মিতির নক্‌শা অঙ্কন, প্রায়োগিক পরামর্শদান ইত্যাদি ব্যাপারে বিভাগ সহায়তা ও পরিষেবা প্রদান করবে।

(৬) ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী বাস্তুকার জেলা পরিষদ/ পুরসভা / পৌর কর্পোরেশনকে প্রকল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত রকম হিসেব পরীক্ষার কাজে সহায়তা করবেন।

(৭) জেলা পরিষদ/ পুরসভা/ পুর কর্পোরেশনের তরফে ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী বাস্তুকার বিভাগীয় হিসেবরক্ষার জন্য নির্দিষ্ট হিসেব-খতিয়ানের থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র একটি খতিয়ানে, প্রকল্পের কাজে প্রাথমিক জমাখরচের হিসেব বজায় রাখবেন। বিভাগীয় কাজে ব্যয়িত মাসিক হিসেব যা নির্বাহী বাস্তুকারকে পশ্চিমবঙ্গের মহাগাণনিকের কাছে পেশ করতে হয়, সেখানে এই জমা খরচের অঙ্ক প্রদর্শিত হবে না। যাইহোক, ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী বাস্তুকার হিসেব রক্ষার কাজে জেলা পরিষদ/ পুরসভা/ পৌর কর্পোরেশন অনুমোদিত ফর্মা ব্যবহার করবেন নির্বাহী বাস্তুকারের সম্পূরক ক্যাশ বইতে লেনদেনের যে বিবরণ থাকবে তা জেলা পরিষদ/ পুরসভার মূল ক্যাশ বইতে সময়ের সুনির্দিষ্ট ব্যবধানে লিপিবদ্ধ করতে হবে। হিসেব রক্ষার পদ্ধতিক্রমের সরলীকরণের জন্য, জেলা পরিষদ/ পুরসভা/ পৌর কর্পোরেশন যদি সুবিধে বোঝেন তবে এ ধরনের প্রকল্পের কাজ নিযুক্তক ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আবন্টন করা যেতে পারে—সেই সঙ্গে প্রকল্পের কাজে ব্যবহার্য জিনিসপত্রের সরবরাহ অথবা প্রয়োজন মাফিক যন্ত্রপাতি মেশিন ইত্যাদি ভাড়া করার বরাত দেওয়া যেতে পারে। এর ফলে বিলের মাধ্যমে প্রকল্পের কাজের সামগ্রিক ব্যয়ভারের বিশদ প্রতিফলন ঘটবে। ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী বাস্তুকার পৃথক পৃথক মাপ বইতে নিযুক্তক-সংস্থাসমূহের বিল ও বিলফর্মা প্রস্তুত করবেন। বিল পাশ হলে তিনি প্রাথমিকভাবে জেলা পরিষদ/ পঞ্চায়েত সমিতি/ পুরসভা/ পৌর কর্পোরেশনকে একটি উপযুক্ত অধিযাচন নিদর্শে কাজের দরপত্রের চুক্তি/ নিযুক্তকের নাম/ বিলের গুরুত্ব ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদান সহ পাশ হওয়া বিলগুলোতে উল্লিখিত অর্থ পরিমাণ সংশ্লিষ্ট নিযুক্তক সংস্থাকে চেকের মাধ্যমে প্রদান করার অনুরোধ রাখবেন। প্রামাণিক বিবৃতি সম্বলিত নির্বাহী বাস্তুকারের অনুমোদিত এইরকম বিল পাওয়ার পর এবং জেলা পরিষদ/ মহকুমা পরিষদ/ পঞ্চায়েত সমিতি/ পুরসভা/ পুর কর্পোরেশনের হিসেবের খতিয়ানে চেক সংক্রান্ত বিবরণী যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হলে, জেলা পরিষদ নির্বাহী বাস্তুকারের কাছে নিযুক্তক ব্যক্তি বা সংস্থাকে অর্থপ্রদানের জন্য চেক প্রেরণ করবে।

(৮) আইনি বিতর্ক সমাধানে, তৎসহ যে কোনো ন্যায়ালয়ের জারি করা ডিক্রি অথবা প্রকল্প সম্পর্কিত বিষয়ে মধ্যস্থতার কারণে প্রয়োজনীয় অর্থভার বহন করবে জেলা পরিষদ/ পুরসভা/ পৌর কর্পোরেশন—প্রকল্প রূপায়ণে সমস্ত রকম উপনিমিত্ত ব্যয়ও বহন করবে জেলা পরিষদ/ পুরসভা/ পৌর কর্পোরেশন। প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদানের কারণে বিভিন্ন সময়ে সিদ্ধান্ত অনুসারে তারা সাময়িক ঋণ গ্রহণ করবে এবং তার আনুপূর্বিক হিসেব রাখবে।

(৯) জেলা পরিষদ/ পৌরসভা/ পৌর কর্পোরেশন যদি আগে থেকেই উপযোগিতা ও গুণমানের নিরিখে বিশেষ ধরনের মালপত্র মজুত করতে ইচ্ছুক হয় এবং ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী বাস্তুকারের নিয়ন্ত্রণাধীন গুদাম ঘরে উক্ত মালপত্র রাখার জন্য পৃথক সংস্থান থাকে তবে জেলা পরিষদ/ পৌরসভা/ পৌর কর্পোরেশনের অর্থব্যয়ের সাপেক্ষে তা সম্ভব হবে এবং সেক্ষেত্রে মজুত দ্রব্যাদির জিম্মাদারী ও দায়িত্বে থাকবেন ওই কাজে ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী বাস্তুকার।

(১০) স্থানীয় প্রশাসনের স্বার্থে ও তরফে ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী বাস্তুকার বিভাগীয় নিয়মনীতি অনুসারে দরপত্র গ্রহণের সীমা মোতাবেক সর্বনিম্ন ব্যয়বিশিষ্ট দরপত্র বা অন্যান্য দরপত্র গ্রহণ করবেন। দরপত্র যদি সীমাতিরিক্তভাবে ব্যয়বহুল হয় তবে, আনুপুঙ্খিক নিরীক্ষার জন্য তিনি তা অধীক্ষক বাস্তুকারের কাছে পেশ করবেন। অধীক্ষক বাস্তুকার তার সুপারিশ ও সুচিন্তিত মন্তব্যসহ সেই দরপত্রগুলো ফেরত পাঠাবেন সংশ্লিষ্ট নির্বাহী বাস্তুকারকে, তিনি এরপর অধীক্ষক বাস্তুকারের মতামত সম্বলিত দরপত্রটি জেলা পরিষদ/ পৌরসভা/ পুর কর্পোরেশনের অনুমোদনের জন্য দাখিল করবেন, এ ব্যাপারে জেলা পরিষদ/ পৌরসভা/ পৌর কর্পোরেশনের সমর্থনের সাপেক্ষে প্রাধিকারী নির্বাহী বাস্তুকার নিযুক্তক সংস্থাকে কার্যনির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ জারি করবেন—সর্বক্ষেত্রেই কার্যারম্ভের আদেশ জারি করার অধিকারী সংশ্লিষ্ট ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী বাস্তুকার।

(১১) জেলা পরিষদ/ পৌরসভা/ পৌর কর্পোরেশনের পক্ষে এই ধরনের প্রকল্পে কার্যনির্বাহের জন্য সমস্তরকম দরপত্র আহৃত হবে ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী বাস্তুকারের দ্বারা। জেলা পরিষদ/ পৌরসভা/ পুর কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে প্রকল্প রূপায়ণের উদ্দেশ্যে দরপত্রের দলিল প্রস্তুত করতে হবে সেচ ও জলপথ বিভাগে অন্যান্য কাজে অনুসৃত নিয়মনীতির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে। বিভাগীয় অধীক্ষক বাস্তুকার যেমন কোনো কোনো পরিস্থিতিতে বিশেষ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে পারেন, দরপত্রের দলিলে নতুন ধারা সংযোজন করতে পারেন, অনুরূপ সব কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার অধিকার জেলা পরিষদকেও দিতে হবে।

(১২) রাজ্য সরকারের পক্ষে এই ধরনের কর্মসূচি পালন ও রূপায়ণ হবে প্রত্যক্ষ বা সরাসরি বিভাগীয় ব্যবস্থাপনায়। বরাবরের মতন এক্ষেত্রেও আধিকারিকগণ বিভাগীয় নির্দেশ অনুসারে দায়িত্ব পালন করবেন।

(১৩) চুক্তির কোনো অংশে যদি নিযুক্তকের উথিত বিতর্কের বিষয়ে বিচারবিভাগীয় হস্তক্ষেপ, রায়দান বা মধ্যস্থতার প্রয়োজন পড়ে তবে পঞ্চায়েত সম্পাদক এবং গ্রামোন্নয়ন বিভাগ দরকার অনুযায়ী উকিল নিয়োজনের ক্ষেত্রে নিয়োগ কর্তা হিসেবে বিবেচিত হবেন।

(১৪) বিভাগে কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকার-নির্দিষ্ট যে সব ভিন্ন ভিন্ন আইন, অনুজ্ঞা, ব্যবহারবিধি চুক্তি ইত্যাদি বলবৎ আছে, প্রকল্প রূপায়ণের প্রয়োজন সাপেক্ষে জেলা পরিষদ/ পৌরসভা/ পৌর কর্পোরেশন এবং স্থানীয় প্রশাসনিক সংস্থাকে ওই সমস্ত বিধিনিষেধের প্রয়োগ ঘটানোর জন্য অনুরূপ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রদান করতে হবে।

(১৫) প্রকল্প রূপায়ণে সর্বাত্মক পরিচালনার কাজে নিযুক্ত স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত আধিকারিক ও কর্মচারীবৃন্দ বিভাগীয় কর্ম সম্পাদনের মতোই অনুরূপ ঐকান্তিকতায় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবেন—এ ধরনের প্রকল্পের কাজে তাদের স্থানীয় প্রশাসনের কাছে কৈফিয়ৎ দেওয়ার দায় বহন করতে হবে।

(১৬) স্থানীয় প্রশাসন মূল বিভাগের অনুমোদন লাভের পর বিভাগের দ্বারা ইতিমধ্যেই সম্পাদিত স্থায়ী ও ফলপ্রসূ কার্যাদির অতিরেকে অন্য কোনো অসম্পাদিত কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিক ও কর্মীবৃন্দকে অনুরোধ করতে পারবে।

(১৭) ক্ষেত্র-আধিকারিক তথা ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী বাস্তুকারদের পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসন, নির্দিষ্ট ক্ষেত্রস্থলে কাজের গতিপ্রকৃতির পর্যবেক্ষণের জন্য প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত সুবিধেভোগবকারী ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে একটি সমিতি গঠন করতে পারে—যদিও সেই সমিতি ক্ষেত্র আধিকারিক অথবা নিযুক্তক অথবা প্রকল্পের কাজে ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গকে কোনরকম নির্দেশ প্রদান করতে পারবে না। তারা শুধু সংশ্লিষ্ট ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী বাস্তুকার অথবা জেলা পরিষদ/ পুরসভা/ পৌর কর্পোরেশনের কাছে কাজের ব্যাপারে কোনো অসংগতি বা সামঞ্জস্যহীনতা লক্ষ করলে তা বিবৃত করতে পারবে।

(১৮) পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে জেলা পরিষদ/ পুরসভা/ পৌর কর্পোরেশনের উল্লেখ থাকলেও সমস্ত পঞ্চায়েত ও পৌর নিয়ন্ত্রণাধীন সমিতির ক্ষেত্রেও এই বিজ্ঞপ্তিটি প্রযোজ্য হবে।

(১৯) পূর্বোল্লিখিত প্রকল্প রূপায়ণের কাজে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত আধিকারিক ও কর্মচারীবৃন্দের ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, বদলি, চাকরির স্থান নির্দেশ, বার্ষিক গোপন প্রতিবেদন ইত্যাদি প্রস্তুত করার দায়িত্বে থাকবেন উপযুক্ত বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ।

(২০) জেলা পরিষদ/ পৌরসভা/ পৌর কর্পোরেশনের পক্ষে ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী বাস্তুকারেরা, স্থানীয় প্রশাসনের সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণে প্রকল্প রূপায়ণের কাজে আগ্রহী যে সমস্ত নিযুক্তকদের কাছ থেকে মূল্যবেদনপত্র আহ্বান করবেন, দরপত্র বা মূল্যবেদনপত্র আহ্বায়ক কর্তৃপক্ষের তরফে তাদের ওই সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক ও বিস্তারিত সমস্ত তথ্য বিশদভাবে জ্ঞাপন করতে হবে।

(২১) প্রকল্প অনুমোদনের কাজটি করবেন বিভাগের যথাযোগ্য কারিগরি আধিকারিকবৃন্দ—যদি না তারা নিজেরাই প্রকল্পের পরিকল্পক হন। ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী বাস্তুকারেরা এই ধরনের কারিগরি অনুমোদন লাভের জন্য বিভাগের উচ্চবর্গীয় আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলবেন।

(২২) আর আই ডি এফ-৫, ৪ অধীনস্থ প্রকল্প এবং তৎপরবর্তী সেচ ও জলপথ বিভাগের সেচ, বন্যানিয়ন্ত্রণ, জল-বিভাজন ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি যে সব বিষয়ে দরপত্র আহ্বানের রীতি এখনও চালু হয়নি সেক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ মূল বিভাগের বাস্তুকার ও তার নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থাসমূহকে কার্যনির্বাহের উল্লিখিত পদ্ধতি-প্রকরণ অনুসারে জেলাস্তরে উক্ত প্রকল্পাদির রূপায়ণে নিযুক্ত করবে।

(২৩) বিজ্ঞপ্তিটি নিম্নোক্ত সংস্থাগুলোর অনুমোদন সাপেক্ষে জারি হচ্ছে :

(ক) পঞ্চায়েত, গ্রামোন্নয়ন বিভাগ এবং পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত বিধি—১৯৭৩-র ২০৭ বি ধারার অন্তর্গত উপধারা (১)

(খ) পৌর বিভাগ এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌরবিধি ১৯৯৩-র ৬৫নং ধারা।

(গ) অর্থ বিভাগ, এবং

(ঘ) উন্নয়ন ও যোজনা বিভাগ

স্বাক্ষর/- **পি. কে. বসু**

সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সেচ ও জলপথ বিভাগ

সেচপত্র কোথায় কোথায় পাওয়া যায় : জেলাভিত্তিক

❐ কলকাতা ও হাওড়া ❐
নির্বাহী বাস্তুকার
জনসংযোগ ও পরিসংখ্যান শাখা
সেচ ও জলপথ বিভাগ,
জল সম্পদ ভবন [ভূ-তল]
সল্ট লেক, কলকাতা-৭০০ ০৯১
দূরভাষ : ৩৫৮-০৫২৮

❐ ২৪-পরগনা (উত্তর) ❐
নির্বাহী বাস্তুকার
বিদ্যাধর জলনির্গম ভুক্তি
টাকি রোড, বারাসাত,
জেলা : ২৪-পরগনা (উত্তর)
দূরভাষ : ৫৫২-৩৪৮১

❐ ২৪-পরগনা (দক্ষিণ) ❐
নির্বাহী বাস্তুকার
জয়নগর সেচ ভুক্তি, সেচ ও জলপথ দপ্তর
১১এ, মীর্জা গালিব স্ট্রীট,
কলকাতা-৭০০ ০৮৭
দূরভাষ : ২৪৪-২৮৮৭
এবং
নির্বাহী বাস্তুকার
কাকদ্বীপ সেচ ভুক্তি,
সার্ভে বিল্ডিং, আলিপুর
দূরভাষ : ৪৭৯-৬৬৭৮

❐ হুগলি ❐
নির্বাহী বাস্তুকার
হুগলি সেচ ভুক্তি,
পেয়ারা বাগান, ডাক ও জেলা : হুগলি
দূরভাষ : ৬৮০-২৭৩৫

❐ মেদিনীপুর ❐
নির্বাহী বাস্তুকার
পশ্চিম মেদিনীপুর ভুক্তি
সেচ ও জলপথ দপ্তর
মেদিনীপুর, পশ্চিম
দূরভাষ : ০৩২২২/৬২০৭৩
[*অঞ্চল : ঝাড়গ্রাম, গড়বেতা, মেদিনীপুর সদর ১/২ ও সুবর্ণরেখা ব্যারেজ প্রকল্প*]
ও
নির্বাহী বাস্তুকার
পূর্ব মেদিনীপুর ভুক্তি,
সেচ ও জলপথ দপ্তর, মেদিনীপুর, পূর্ব,
[*অঞ্চল : ঘাটাল, তমলুক, কন্টাই ও পাঁশকুড়া*]
দূরভাষ : ০৩২২৮/৬৬৮৮৯

❐ বর্ধমান ❐
নির্বাহী বাস্তুকার
দামোদর ক্যানাল্‌ই ভুক্তি
কোর্ট কম্পাউন্ড, ডাক ও জেলা : বর্ধমান
দূরভাষ : ৫৬২৪৯৬, এস টি ডি : ০৩৪২

❐ বীরভূম ❐
নির্বাহী বাস্তুকার
ময়ূরাক্ষী সাউথ ক্যানালস ভুক্তি
ডাক : শান্তিনিকেতন,
জেলা : বীরভূম
দূরভাষ : ৫২২৫৬, এস টি ডি : ০৩৪৬৩
ও
নির্বাহী বাস্তুকার
ময়ূরাক্ষী উত্তর ক্যানালস ভুক্তি
রামপুরহাট
দূরভাষ : ৫৫০৩৯, এস টি ডি : ০৩৪৬১

❐ বীরভূম ❐
নির্বাহী বাস্তুকার
বাঁকুড়া সেচ ভুক্তি
ডাক : কেন্দুয়াডিহি, জেলা : বাঁকুড়া
পিন : ৭২২ ১০২
এস টি ডি : ০৩২৪২ দূরভাষ : ৫৪৯৩৪

❐ পুরুলিয়া ❐
নির্বাহী বাস্তুকার
পুরুলিয়া সেজ ভুক্তি, ভাট বাঁধ,
ডাক ও জেলা : পুরুলিয়া
পিন : ৭২৩ ১০১,
এস টি ডি : ০৩২৫২ দূরভাষ : ২২৪০৭

❐ নদীয়া ❐
নির্বাহী বাস্তুকার
নদীয়া সেচ ভুক্তি, কৃষ্ণনগর
এস টি ডি : ০৩৪৭২ দূরভাষ : ৫২৪৫১

❐ জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার ❐
নির্বাহী বাস্তুকার
জলপাইগুড়ি সেচ ভুক্তি
ক্লাব রোড, জলপাইগুড়ি
এস টি ডি : ০৩৫৬১ দূরভাষ : ৩০২৪৯
নির্বাহী বাস্তুকার
কোচবিহার সেচ ভুক্তি
এস টি ডি : ০৩৫৮২ দূরভাষ : ২২৩০৫

❐ আলিপুরদুয়ার ❐
নির্বাহী বাস্তুকার
আলিপুরদুয়ার সেচ ভুক্তি
আলিপুরদুয়ার কোর্ট
এস টি ডি : ০৩৫৬৪ দূরভাষ : ৫৪৩০৫

❐ দার্জিলিং ❐
নির্বাহী বাস্তুকার (TBP)
তিস্তা মনিটরিং অ্যান্ড এভাল্যুয়েশন ডিভিশন্‌
অ্যাডমিনিস্ট্রিশন বিল্ডিং, তিনবাত্তি মোড়
শিলিগুড়ি, জেলা : দার্জিলিং
এস টি ডি : ০৩৫৩ দূরভাষ : ৪৬২৩৬৯
ও
শিলিগুড়ি সেচ ভুক্তি
আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি
এস টি ডি : ০৩৫৩ দূরভাষ : ৮৩১৮৪২

❐ দিনাজপুর ❐
(উত্তর ও দক্ষিণ)
নির্বাহী বাস্তুকার
উত্তর দিনাজপুর ভুক্তি
ডাক : রায়গঞ্জ, জেলা : উত্তর দিনাজপুর
এস টি ডি : ০৩৫২৩, দূরভাষ : ৫২০০৮
নির্বাহী বাস্তুকার (TBP)
তিস্তা ক্যানালস সদর ভুক্তি
কর্ণঝোড়া, রায়গঞ্জ
এস টি ডি : ০৩৫২৩ দূরভাষ : ৫২৩১৯
নির্বাহী বাস্তুকার
দক্ষিণ দিনাজপুর ভুক্তি
বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর
এস টি ডি : ০৩৫২২ দূরভাষ : ৫৫১১৩

❐ মুর্শিদাবাদ ❐
নির্বাহী বাস্তুকার
বহরমপুর সেচ ভুক্তি
ডাক : বহরমপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ
এস টি ডি : ০৩৪৮২ দূরভাষ : ৫০৬৪৫

❐ মালদহ ❐
নির্বাহী বাস্তুকার
মালদহ সেচ ভুক্তি
গ্রীন পার্ক, জেলা : মালদহ
এস টি ডি : ০৩৫১২ দূরভাষ : ৫২৩৯৫

প্রধান সম্পাদক ❐ চন্দন রায় ❐ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগের পক্ষে রণজিৎকুমার নাগ, অধীক্ষক বাস্তুকার কর্তৃক জলসম্পদ ভবন, বিধাননগর থেকে প্রকাশিত ও বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, ১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা- ১২ থেকে মুদ্রিত।

Chief Editor ❐ CHANDAN ROY. Published by RANJIT KUMAR NAG on behalf of Irrigation & Waterways Department, Government of West Bengal, Jalasampad Bhaban, Bidhan Nagar, Kokkata-700 091 & Printed by him from Basumati Corporation Ltd. 166 B. B. Ganguly Street, Kolkata-700 012.

State of West Bengal some Basic Facts

1.	Geographical Area	— 88752 sq. km.
2.	No. of Districts	— 18
3.	Population	— 68.08 million (1991 census)
4.	Population Density	— 767 per sq. km. (highest in India as per 1991 census)
5.	Gross Cropped Area	— 78.42 lakh ha.
6.	Ultimate Irrigative Potential so far assessed	— 70.00 lakh ha.
7.	Ultimate Irrigative Potential from Major & Medium Projects	— 26.83 lakh ha.
8.	Irrigation Potential created till 1999-2000 through Major & Medium Projects	— 14.30 lakh ha.
9.	Surface Water Resources	— 132.90 lakh ha. m.
10.	Ground Water Resources	— 14.60 lakh ha. m.
11.	Total Flood Prone Area	— 37660 sq. km.
12.	Area already protected upto 1999-2000	— 22005 sq. km.
13.	Length of Embankment upto 1999-2000	— 10350 km.
14.	Length of Drainage channel upto 1999-2000	— 7129 km.
15.	No. of Towns protected so far	— 74
16.	Coastal Length	— 280 km.
17.	Length of Embankment along Sea & Estuarine rivers	— 4000 kms. (approx.)

Development of Irrigation Potential (Cumulative)

Area in th. ha.

Upto 1947-48	1955-56	1960-61	1965-66	1973-74	1979-80	1984-85	1989-90	1996-97	1999-2000
112.30	184.00	482.00	626.00	845.00	1076.00	1136.00	1236.00	1335.54	1429.70

Development in Flood Control and Drainage

Year	Area Protected from flood drainage Km^2	Length of Embankment Km	Length of Drainage channel Km	No. of Towns protected
1947	725	5900	69	8
2000	22005	10350	7129	74

REGD. No. WBBEN / 2000 / 1027